পৃথিবীর ইতিহাস

ইতিহাস

জওহরলাল নেহরু

পৃথিবীর ইতিহাস

জওহরলাল নেহেরু

অনুবাদ : প্রবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর ইতিহাস
জওহরলাল নেহরু
অনুবাদ : প্রবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত
Bengali Translation of Letters from A Father To His Daughter by Jawaharlal Nehru

বাংলা অনুবাদ প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪১
বুক ক্লাব প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০০

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
অলঙ্করণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক:
সাইফুর রহমান চৌধুরী
বুক ক্লাব
৩৮/৪ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০।

কম্পোজ:
সোহেল কম্পিউটার
৫০১/১ বড় মগবাজার,
বেপারি গলি,
ঢাকা-১২১৭।

মুদ্রক:
চৌকস প্রিন্টার্স
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড,
ফকিরেরপুল,
ঢাকা-১০০০।

পরিবেশক:
সন্দেশ
১৬ আজিজ সুপার মার্কেট,
শাহবাগ,
ঢাকা-১০০০।

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা

ISBN-984-821-029-6

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

১৯২৮ সনের গ্রীষ্মঋতুতে, এই চিঠিগুলি আমি আমার কন্যা ইন্দিরাকে লিখেছিলাম। ইন্দিরা তখন হিমালয় শৈলে মুসৌরিতে ছিল, আর আমি ছিলাম নিচে এলাহাবাদে। দশ বৎসরের ছোট একটা মেয়েকে এই চিঠিগুলি ব্যক্তিগতভাবে লেখা, কিন্তু আমার যেসব বন্ধুবান্ধবের উপদেশ আমি মূল্যবান বলে মনে করি, তাঁরা বলেছেন এই চিঠিগুলির মধ্যে নাকি তাঁরা কিছু ভালো জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন এবং আমার নিকট প্রস্তাব করেছেন, আমি যেন চিঠিগুলি বৃহত্তর পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করি। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের এই চিঠিগুলি কেমন লাগবে আমি জানি না, তবু এইটুকু আশা করি, যে-সব ছেলেমেয়েরা এই চিঠিগুলি পড়বে তারা হয়তো ধীরে ধীরে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে যে, আমাদের এই পৃথিবী কতকগুলি বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ একটা পরিবার। আর এই ভরসাও করি— অবশ্য খানিকটা সঙ্কোচের সহিতই—যে, এই চিঠিগুলি লিখবার সময় আমি যেমন আনন্দ পেয়েছি তারই খানিকটা হয়তো আমার ঐ পাঠকবৃন্দও পাবে।

চিঠিগুলি হঠাৎ শেষ হয়েছে। দীর্ঘ গ্রীষ্মঋতুর অবসান হল, ইন্দরাকেও শৈলাবাস থেকে নেমে আসতে হল। ১৯২৯-এর গ্রীষ্মঋতুতে মুসৌরি অথবা অন্য কোনো শৈলাবাসে আর ওর যাওয়া হয়নি। শেষের তিনখানা চিঠিতে একটা নতুন যুগের সূচনা মাত্র হয়েছে, কাজেই এই কয়খানা চিঠি এখানে স্থানোপযোগী হয় নাই বলেই মনে হবে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এইগুলিকে আমি এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেছি, কারণ, ওদের সমাপ্তির দিকে টেনে নেবার সুযোগ আর আমার কখনো হবে কিনা জানি না।

জওহরলাল নেহেরু

এলাহাবাদ
নভেম্বর, ১৯২৯

www.nagorikpathagar.org

প্রধানমন্ত্রী ভবন
নয়াদিল্লি
১ নভেম্বর, ১৯৭৩

বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে নিজেদের মা-বাবাকে দেবতার মতো মনে করে। আমার মা-বাবা যেমন আমার পরম বন্ধু ছিলেন সে রকম কিন্তু সকলের মা-বাবা হন না। সব কিছুতেই আমার বাবার আগ্রহ ছিল। নিজের কৌতূহলকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন। অনেক রকম প্রশ্ন আমার মনে জাগত। আর এই প্রশ্নগুলির জন্যেই তিনি আমাকে পৃথিবী সম্পর্কে নানা কথা বলতে পেরেছিলেন—যে সব মানুষ এখানে বাস করত তাদের কথা, তাদের আদর্শ ও কাজকর্ম এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে কীভাবে তারা অন্যদের মুগ্ধ করেছিল সেই সব কথা। সবচেয়ে বড় কথা হল, তিনি আমাদের এই বিস্ময়কর দেশের কথা বলতে এবং লিখতে ভালবাসতেন—দেশের অতীতকালের কীর্তি ও ঐশ্বর্যের কথা এবং পরে কীভাবে দেশের পতন হল এবং দেশ পরাধীন হল। একটি চিন্তাই তাঁর মনে সব সময় জেগে থাকত—তা হল স্বাধীনতা। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে স্বাধীনতা।

আমার বয়স যখন আট কিংবা নয় তখন এই বইয়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম যুগের কথা এবং কীভাবে মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সে কথা চিঠিগুলিতে বলা হয়েছে। এ চিঠিগুলি শুধু একবার পড়েই ফেলে দেবার মতো নয়, এগুলি পড়ে আমি নতুন চোখে সব কিছু দেখতে শিখি। এগুলি মানুষের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে এবং চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে আমার মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। এসব চিঠি পড়েই প্রকৃতিকে একটি বই হিসেবে দেখতে শিখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে আমি পাথর, গাছপালা, পোকামাকড়দের জীবন এবং রাত্রে আকাশের নক্ষত্র লক্ষ্য করে দেখেছি।

এর আগে এই চিঠিগুলি বিভিন্ন ভাষায় বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস যে এই আকর্ষণীয় পুনর্মুদ্রণ ছেলেমেয়েদের ভাল লাগবে। তাদের সামনে এক নতুন দিক খুলে দেবে, যেমন আসল চিঠিগুলো পড়ে আমার নিজের জীবনে হয়েছিল।

ইন্দিরা গান্ধী

www.nagorikpathagar.org

আমার কথা

টিউবারকুলোসিস রোগে ভুগছি। এক বন্ধু একদিন জওহরলালের Letters from a Father to His Daughter বইখানা পড়তে দিলেন। বইখানা পড়ে ভারি ভালো লাগল। আমাদের এই পৃথিবীর কথা, আমাদের কত চেনা, কত আপনার পৃথিবী, তবু কী রহস্যময়! যুগযুগান্তরের কী রহস্য এই পৃথিবী তার বুকে লুকিয়ে রেখেছে, মানুষ খুঁজে বের করতে চায় তাকে। 'হাইডেলবার্গ ম্যান', 'পেকিন ম্যানকে সে খুঁজে বের করেছে, 'ডাইনোসোর', 'ম্যামথ', এদের ফসিল আবিষ্কার করেছে; লক্ষ কোটি বছর আগের পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর যোগসূত্র বের করবার জন্য মানুষের অনুসন্ধানের কাজ আর অবধি নাই। আর মানুষের ইতিহাস, তাই বা কী বিচিত্র। সেই কত সহস্র বছর আগের গুহাবাসী মানুষ—মানুষ নয়, পশু—অনন্ত কালের পথে তার হাঁটি-হাঁটি পা, তার প্রগতি, পশুত্বকে জয় করবার আকাঙ্ক্ষা, অজানাকে জানবার তার ইচ্ছা, এই তো তার সত্যিকার ইতিহাস।

জওহরলালজি : চিঠিগুলি তাঁর ছোট্ট মেয়ে ইন্দিরাকে লিখেছিলেন—১৯২৮ সনের কথা। ইন্দিরার বয়স তখন দশ বৎসর। আমার বাড়ির ভাইবোনদের পড়াবার জন্যই বইখানা অনুবাদ করেছিলাম। রুগ্‌ণ অবস্থায়, বইখানা অনুবাদ করে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। আমার সেই আনন্দের একটুকু ভাগও যদি আমার দেশের, আমার স্নেহের ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে দিতে পারি, সেই আশাতেই 'জওহরলালের চিঠি' প্রকাশ করলাম।

যেসকল বন্ধুর উৎসাহে ও সযত্ন চেষ্টায় আমার রুগ্‌ণ অবস্থাতেও এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হল, তাঁদের সবাইকে আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। জওহরলালজি বইখানা অনুবাদ করবার অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

ইতি—

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত

কুমিল্লা
আশ্বিন, ১৩৪১ বাং

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'জওহরলালের চিঠি'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই অনুবাদ গ্রন্থ পাঠকদের হাতে দেবার আগে মনে আমার যথেষ্ট ভয় হয়েছিল, জওহরলালজির নিপুণ লেখনীপ্রসূত সুন্দর একটি জিনিস হয়তো আমি হাতে নিয়ে নষ্ট করে ফেলেছি, কিন্তু বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাতে এই পুস্তকের সমালোচনা পাঠ করে আমার সেই ভয় কথঞ্চিৎ দূর হয়েছিল। এখন প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় মনে হচ্ছে, যাদের জন্য ইংরেজি পুস্তকখানা অনুবাদ করেছিলাম, তাদের নিকটও উহা আদর লাভ করেছে। স্বাস্থ্যহীন জীবনে আমার পক্ষে আজ ইহা কম সান্ত্বনার বিষয় নয় যে, একটি সত্যিকার ভাল জিনিস আমার দেশের ভাইবোনদের উপযোগী করে তাদের হাতে আমি পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছি। আজ আমি তাই কৃতার্থ বোধ করছি, আর এই সুযোগে আমার দেশের ভাইবোনদের নিকটও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়, এম.এ., পি.আর. এস, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন; আমার প্রতি স্নেহবশত তিনি বইখানা এই সংস্করণের জন্য আগাগোড়া দেখে দিয়েছেন এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনানুরূপ সংশোধনও করে দিয়েছেন। মামুলি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা তাঁর এই স্নেহের ঋণ আমি আর কতটুকুই বা শোধ করতে পারব! কাজেই সেই চেষ্টা করব না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন বানানবিধি এই সংস্করণে গ্রহণ করেছি।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দাশগুপ্ত

কুমিল্লা
শ্রাবণ, ১৩৪৬ বাং

www.nagorikpathagar.org

সূচি

প্রকৃতির শিক্ষা ■ ৯
প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান ■ ১২
পৃথিবীর জন্মকথা ■ ১৫
প্রাণের সূচনা ■ ১৮
প্রাণীর আবির্ভাব ■ ২২
ঊষা-মানব ■ ২৭
প্রস্তর-যুগ ও সেই যুগের মানুষ ■ ৩০
ভিন্ দেশের ভিন্ জাতি ■ ৩৫
বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাষা ■ ৩৮
বিভিন্ন ভাষার সম্পর্ক ■ ৪১
সভ্যতা কী? ■ ৪৪
সভ্যতার প্রথম ধাপ—মানুষের দল গঠন ■ ৪৬
ধর্মের সূচনা ও কর্ম-বিভাগ ■ ৪৯
সভ্যতার ধাত্রী-কৃষি ■ ৫৩
দলপতির গল্প ■ ৫৬
দলপতির আরো গল্প ■ ৫৮
দলপতির রাজ্যাভিষেক ■ ৬০
প্রাচীন সভ্যতা ■ ৬২
প্রাচীন যুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর ■ ৬৪
মিশর ও ক্রিট ■ ৬৭
চীন ও ভারতবর্ষ ■ ৭২
ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা ■ ৭৫
ভাষা, লিপি ও সংখ্যা-প্রণালী ■ ৭৯
সমাজে শ্রেণীবিভাগ ■ ৮২
রাজা, পুরোহিত ও মন্দির ■ ৮৪
কথা কও কথা কও অনাদি অতীত ■ ৮৬
ফসিল এবং অতীতের স্মৃতি ■ ৮৮
ভারতে আর্য জাতি ■ ৯১
ভারতীয় আর্যগণ কেমন ছিলেন ■ ৯৩
রামায়ণ ও মহাভারত ■ ৯৫

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রকৃতির শিক্ষা

যখন তুমি আমার কাছে থাকো, তুমি আমাকে প্রায়ই নানা রকমের প্রশ্ন কর, আমিও তার উত্তর দিতে চেষ্টা করি। এখন তুমি রয়েছ মুসৌরি, আর আমি আছি এলাহাবাদ, আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা কিন্তু এখন আর তেমনটি হবার জো নেই। তাই আমি ভাবছি, আমাদের এই পৃথিবী আর তার যেসব ছোট বড় নানা দেশ আছে, তারই গল্প তোমাকে মাঝে মাঝে চিঠিতে লিখব। তুমি তো ইংল্যান্ড আর ভারতবর্ষের ইতিহাস কিছু কিছু পড়েছ। ইংল্যান্ড কিন্তু একটি অতি ছোট্ট দ্বীপ, আর ভারতবর্ষ একটা মস্ত দেশ হলেও পৃথিবীর একটি অতি ছোট অংশ; কাজেই পৃথিবীর কথা কিছু জানতে হলে, কেবল আমাদের নিজেদের জন্মভূমির কথা জানলেই হবে না, আরও যেসব দেশ আছে, আরও যেসব জাতি আছে, তাদের কথাও আমাদের জানতে হবে।

হয়তো, আমার এই চিঠিগুলিতে তোমাকে অল্প কথাই লিখতে পারব, কিন্তু অল্প হলেও আমার মনে হয়, এ-গুলি তোমাকে আনন্দ দেবে, এবং এই মস্ত পৃথিবীটা যে একটা দেশ, আর তার সব জাতের মানুষই যে আমাদের ভাইবোন, সেই কথাটাও তুমি বুঝতে পারবে। বড় হয়ে, পৃথিবী আর তার মানুষের কথা, তুমি অনেক মোটা মোটা বইতে পড়বে, সে-সব কথা তোমার গল্প আর উপন্যাসের বইয়ের চেয়েও অনেক ভালো লাগবে।

তুমি তো জানোই আমাদের এই পৃথিবীটা মস্ত বুড়ি, বহু লক্ষ বৎসর এর বয়স। কিন্তু বহু বহু বৎসর ধরে এর বুকে মানুষের বাসের কোনো চিহ্নই ছিল না। মানুষের জন্মেরও আগে পৃথিবীতে বাস করত নানা রকমের জন্তু, আর তারও আগে এই পৃথিবীতে কোনো রকমের প্রাণীর চিহ্নই ছিল না। আজ দেখছ কত রকমের মানুষ, আর জীব জন্তুতে ভরা আমাদের এই পৃথিবী; কিন্তু এমনও একদিন ছিল, যখন এসব কিছুই ছিল না। ভাবতে ভারি অদ্ভুত ঠেকে—না? কিন্তু বৈজ্ঞানিক আর মস্ত মস্ত পণ্ডিতেরা, যাঁরা এ নিয়ে অনেক ভেবেছেন, তাঁরা বলেন যে, পৃথিবী একদিন এত গরম ছিল যে কোনো প্রাণীরই এখানে বাস করা সম্ভব ছিল না। আমরা যদি তাঁদের লেখা বই পড়ি, আর নানা রকমের পাথর আর পুরানো জীব-জন্তুর দেহাবশেষ (fossil) নিয়ে নাড়াচাড়া করি, তবে এই সত্য কথাটা অবশ্য আমরা নিজেরাও বুঝতে পারব।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস পাঠ কর তুমি বই থেকে। কিন্তু সেই আদ্যি কালে যখন মানুষেরই জন্ম হয়নি, তখন বই আর আসবে কোথা থেকে? সেই সময়কার কথা কেমন করে জানা যায় বলতো? বসে বসে চিন্তা করে মনগড়া গল্প বানালে তো চলবে না? এ-রকম ভেবে ভেবে গল্প তৈরি করতে পারলে কিন্তু মন্দ হত না, দিব্যি নিজের মনগড়া সুন্দর সুন্দর রূপকথার সৃষ্টি করা যেত—কিন্তু সত্য থাকত না তার মধ্যে একটুও, আর আমাদের চোখে দেখা ঘটনার সাথেও তার মিল হত না কিছুই। সেই আদ্যি কালের লেখা কোনো বই আমাদের হাতে না থাকলেও আমাদের কাছে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা কিনা ঠিক বইয়ে লেখা ঘটনার মতোই সত্য কথা বলে। জান আমাদের কাছে কী কী আছে? আমাদের কাছে আছে পাথর-পাহাড়, আছে তারকা আর সমুদ্র, আছে নদী আর মরুভূমি, আর আছে প্রাচীন জীব-জন্তুর কঙ্কাল। এ-সব আর এমনি ধারা আরো অনেক জিনিস—এরাই হল পৃথিবীর আদিম যুগের ইতিহাসের বই। অন্যের লেখা বই পড়ে, পৃথিবীর যুগ-যুগান্তের কাহিনী আমরা সবটা জানতে পারব না। তার জন্য আমাদের যেতে হবে, প্রকৃতিদেবীর নিজের হাতের লেখা যে একখানা বই আছে, তাই খুঁজতে। কেমন করে যে এই পাথর আর পাহাড় থেকে ইতিহাস পাঠ করা যায়, তার প্রণালীটা, আশা করি, তুমি শীঘ্রই শিখতে আরম্ভ করবে। ভেবে দেখ তো কী আশ্চর্য বিস্ময়ের কথা, রাস্তার পাশে অথবা পাহাড়ে গায়ে ঐ যে ছোট্ট পাথরের নুড়িটা পড়ে রয়েছে, ওটাই হয়তো প্রকৃতির নিজের হাতে লেখা বইয়ের একখানা ছোট্ট পাতা! এর ভাষার 'অ, আ, ক, খ'-টা যদি তুমি শিখে নিতে পার, দেখবে ঐ পাথরের নুড়িটাও প্রকৃতির রহস্যের একটুখানি কথা তোমাকে বলে দেবে। হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি এ-সব ভাষার বই পড়তে হলে যেমন প্রথমেই সেই ভাষার বর্ণপরিচয় হওয়া তোমার দরকার, তেমনি পাহাড়-পাথরের বইয়ে প্রকৃতির কথা পড়তে হলেও, তার পাঠশালায় 'অ, আ, ক, খ' তোমাকে প্রথমে শিখে নিতে হবে। হয়তো এর মধ্যেই এই বইখানা পড়বার প্রণালীটা তুমি একটু একটু শিখেছ। ভেবে দেখ তো, একটা চক্‌চকে গোল পাথরের নুড়ি তোমাকে কিছু বলে কিনা। এমন হল কী করে যে, পাথরের নুড়িটার একটা কোণও বেড়িয়ে নেই, একেবারে গোল; আর কেমন করেই বা এটা এতো মসৃণ চক্‌চকে হল যে, এর একটা দিকও এবড়ো থেবড়ো নয়। যদি একটা বড় পাথরকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেল, দেখবে প্রত্যেকটা টুকরোই কেমন এবড়ো-থেবড়ো, কোণগুলি সব বেরিয়ে আছে, ধারগুলি মোটেই সমান নয়, দেখতে একটা টুকরোও ওই গোল মসৃণ পাথরের নুড়িটার মতো নয়। ঠিক ঠিক যার শুনবার কান আছে, আর দেখবার চোখ আছে, তাকেই এ তার জীবনের কাহিনী বলবে। শোন এ কী বলছে—"সে বহু দিনের কথা—আমি ছিলাম একদিন অনেক কোণ, অনেক ধারওয়ালা একটা পাথর। ঐ যে বড় পাথরটার থেকে একটা টুকরো ভেঙ্গে নিয়েছে, ঠিক অমনি। কী-জানি কোন্ একটা পাহাড়ের গায় পড়েছিলাম। তারপর একদিন বৃষ্টি এসে আমাকে ধুইয়ে নিয়ে গেল নিচের উপত্যকায়; সেখানে আমি এক ঝরনার সন্ধান পেলাম। ঝরনা আমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল একটা ছোট্ট নদীর মধ্যে। ছোট্ট নদীটা আমাকে

www.nagorikpathagar.org

সাথে করে নিয়ে গেল আরেকটা বড় নদীতে। তারপর থেকে নদীর নিচে পড়ে আমি অনবরত ঘুরপাক খেয়েছি, চারদিকটা আমার ক্ষয় হয়ে গেছে, এবড়ো-খেবড়ো গাটা এখন হয়েছে মসৃণ আর চক্‌চকে। কেমন করে যেন নদীটা আমাকে পেছনে ফেলেই একদিন চলে গেল, তাই তুমি আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছ। নদীটা যদি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত, আমি তবে ছোট হতে হতে একদিন হয়ে যেতেম ছোট্ট একটা বালুকণা, আর সমুদ্র তীরে গিয়ে মিশ্‌তাম আমারই মতো আমার ছোট্ট ছোট্ট ভাইগুলির সাথে। আমার সেই ভাইগুলি মিলেই তৈরি করছে সমুদ্রের বেলাভূমি যেখানে ছোট শিশুরা খেলা করে, আর বালু দিয়ে তাদের খেলা-ঘর তৈরি করে।"

তোমার চোখের সামনে যে পাথরের নুড়িটা দেখছ তার জীবনের কাহিনী এই। একটা ছোট পাথরের নুড়িরই দেখ কত কথা বলবার আছে। এখন ভেবে দেখতো বড় বড় পাষাণ-পাহাড়, আর আমাদের চারদিকের সব জিনিস থেকে আমরা কত কিছুই না শিখতে পারি!

www.nagorikpathagar.org

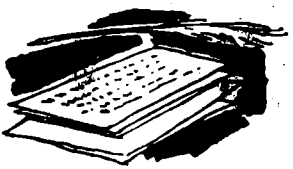

প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান

আমার কালকের চিঠিতে তোমাকে লিখেছিলাম যে পৃথিবীর প্রাচীন যুগের কাহিনী জানতে হলে, আমাদের প্রকৃতি দেবীর নিজের হাতের লেখা বইখানা পড়তে হবে। এই বইখানার উপাদান কিন্তু আর কিছুই নয়, তোমার চারদিকে যে সব বস্তু দেখছ তারাই, যেমন—পাথর, পাহাড়, উপত্যকা, নদী, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি। এমন একখানা বই আমাদের চোখের সামনে খোলা পড়ে আছে, সমস্তক্ষণের জন্য; কিন্তু কয়জনেরই বা এর প্রতি মনোযোগ আছে, আর কয়জনই বা এই বইখানা পড়বার চেষ্টা করে! এই বইখানা যদি আমরা পড়তে আর বুঝতে পারি, কত বিস্ময়ের কাহিনীই না এ আমাদের বলে দেবে। এর পাথরের পাতার গায় যেসব কাহিনী লেখা রয়েছে, সেসব কাহিনী রূপকথার গল্পের চেয়েও অনেক মজাদার।

যেদিন পৃথিবীতে মানুষ ছিল না, কোনো রকমের প্রাণী ছিল না, সেই অতীত দিনের কাহিনী আমরা প্রকৃতির এই বইখানা থেকে জানতে পারি। পড়তে পড়তে আমরা দেখব, আদিম প্রাণীর সৃষ্টি হল একদিন, তারপর আস্তে আস্তে আরও নানা রকমের প্রাণীর সৃষ্টি হল, তারও পরে সৃষ্টি হল মানুষের—নর ও নারী—কিন্তু আজকের দিনের মানুষের চেয়ে তারা ছিল একেবারে ভিন্ন। সেদিনের আদিম মানুষ জন্তুজানোয়ারের চেয়ে বড় ভিন্ন ছিল না। আস্তে আস্তে সেই আদিম মানুষের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হল—ক্রমেই সে নূতনতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগল। এই চিন্তা করবার শক্তিই মানুষকে অতিকায় এবং ভয়ংকর সব জন্তুর চেয়ে শক্তিমান করে তুলল। আজ তুমি দেখছ একজন ছোট মানুষ একটা মস্ত হাতির পিঠে চড়ে ওকে দিয়ে তার ইচ্ছামতো সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে। হাতির পিঠের ওপর ঐযে ছোট্ট মানুষটা বসে আছে ওর চেয়ে হাতিটা অনেক বড়, অনেক বলবান। কিন্তু মানুষ তার বুদ্ধির জোরে হয়েছে প্রভু, আর হাতিটা তার হুকুমের তাঁবেদার। চিন্তা-শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষও ক্রমেই হতে লাগল চতুর আর বুদ্ধিমান। সে অনেক নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করল—কেমন করে আগুন জ্বালাতে হয়, কেমন করে মাটি চষে শস্য জন্মাতে হয়, কেমন করে পরণের কাপড় বুনতে হয়, কেমন করে থাকবার ঘর তৈরি করতে হয়—এ-সব। তারপর কতকগুলি নরনারী একত্র হয়ে বসবাস শুরু করল, আর এমনি করেই জনপদের প্রথম পত্তন হল। এরকম জনপদ তৈরি হবার আগে, মানুষেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াত, থাকবার হয়তো কোনো রকমের তাঁবু-টাবু ছিল। তখন পর্যন্তও কিন্তু মানুষ মাটি চষে শস্য জন্মাতে শেখেনি। কাজেই সে-সময় চাউল

www.nagorikpathagar.org

ছিল না, রুটি তৈরি করবার আটা, ময়দা ছিল না, শাক-সবজি ছিল না, আর আজকের দিনে যে সব সুখাদ্য তোমরা আহার কর, তারও কিছুই তারা জানত না। হয়তো কোনো রকমের বুনো ফল-বাদাম ছিল যা তারা খেত, কিন্তু পশুর মাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য।

এই জনপদ অথবা শহরগুলি ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ হতে লাগল; আর মানুষও সেই সাথে নানা রকমের নূতন নূতন শিল্প কাজ আবিষ্কার করতে আর শিখতে লাগল। লিখবার প্রণালীও মানুষ এক সময় আবিষ্কার করল। বহুদিন পর্যন্ত কিন্তু কাগজের আবিষ্কার হয় নাই। প্রথম অবস্থায় মানুষ ভুর্জপত্রে অথবা তালপাতায় লিখত। আগাগোড়া তালপাতায় লেখা পুথি এখনও কোনো কোনো লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। তারপর এল কাগজের যুগ, লেখাটাও সেই সঙ্গে অনেক সহজ হয়ে গেল। কিন্তু তখন পর্যন্তও ছাপাখানার আবিষ্কার হয় নাই, কাজেই এখনকার মতো হাজার হাজার বই একই দিনে ছেপে ফেলা সম্ভব ছিল না। একখানা বই কেবল একবারই লেখা হত, তার থেকেই শেষে অন্যগুলি নকল করে নিতে হত। কাজেই বুঝতে পার, অনেক অনেক বই সে-দিনে ছিল না। একখানা বই কিনতে বইয়ের দোকানে ছুটে গেলেই হত না। একজন কাউকে দিয়ে বইখানা নকল করিয়ে নিতে হত, এতে সময় লাগত অনেক। তখনকার দিনে লোকে বই লিখত হাতে, হাতের লেখা কিন্তু তাদের খুব সুন্দর ছিল। অনেক লাইব্রেরিতে, হাতে লেখা খুব সুন্দর সুন্দর বিস্তর পুরানো বই আজও রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষে তো বিশেষ করে সংস্কৃত, পারস্য ও উর্দু ভাষায় এমনি হাতেলেখা বই অনেক আছে। কখনো কখনো এই নকল-নবিশগণ বইয়ের পাতায় নানা রকমের সুন্দর সুন্দর ফুল আর ছবি এঁকে বইখানাকে চিত্রিত করত।

শহর সব গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ আর জাতিও সব গড়ে উঠতে লাগল। যেসব লোক কাছাকাছি একই দেশে বাস করত, স্বভাবতই তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল। অন্য দেশের লোকের চেয়ে সবাই নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবত, কাজেই বোকার মতো পরস্পর লড়াই করে মরত। সেদিনে মানুষ বুঝত না, আজকের দিনেও কিন্তু মানুষ এই সহজ কথাটা বুঝতে শিখেনি যে, মারামারি করে একে অন্যের প্রাণবধ করা সবচেয়ে বোকামি, এতে কার-ই বা কী উপকার হয় বলতো?

মাঝে মাঝে নানা প্রাচীন পুথির খোঁজ আমরা পাই, যা থেকে আদিম যুগের নগর ও দেশের কাহিনী আমরা জানতে পারি। এমন সব পুথি অবশ্য অনেক নেই, তা হলেও আরও এমন অনেক জিনিস আছে যা থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। সেই পুরাকালের রাজা মহারাজাগণ তাঁদের রাজত্বের ঘটনাবলি প্রস্তরফলকে অথবা স্তম্ভ-গাত্রে লিখে রাখতেন। বই তো আর বেশি দিন টেনে না, বইয়ের কাগজ পোকায় কাটে, পচে যায়। পাথরের আয়ু তার চেয়ে অনেক বেশি। এলাহাবাদ দুর্গের অশোক স্তম্ভের কথা হয়তো তোমার মনে আছে। বহু শত বৎসর আগে মহারাজ অশোক ছিলেন এই ভারতবর্ষেরই একজন খুব বড় রাজা, ঐ স্তম্ভের গায়ে তিনি তাঁর এক

www.nagorikpathagar.org

অনুশাসন খোদাই করে রেখেছেন। লক্ষ্ণৌমিউজিয়ামেও তুমি অনেক খোদাই করা প্রস্তরফলক দেখেছ। মহারাজ অশোকের বহু স্তম্ভ আর অনুশাসন ভারতবর্ষের নানা স্থানে দেখতে পাওয়া যায়।

নানা দেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা জানতে পারি, বহু প্রাচীন যুগেও চীন ও মিশরে নানা প্রসিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান হয়েছিল। ইউরোপে তখনও কেবল কতকগুলি অসভ্য জাতিরই বাস ছিল। ভারতের সেই গৌরবময় যুগের কথাও আমরা জানতে পারি যেসময় রামায়ণ, মহাভারত রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ সে-সময় ছিল সম্পদশালী, শক্তিমান দেশ। আজ কিন্তু আমাদের দেশ বড় দরিদ্র, পরাধীন। নিজেদের দেশেও আমরা পরাধীন, ইচ্ছামতো কোনো কিছু করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু চিরকালই আমাদের এই অবস্থা ছিল না, মনে প্রাণে চেষ্টা করলে হয়তো দেশকে আবার স্বাধীন করা যায়, দরিদ্রের ভাগ্যের উন্নতি করা যায় এবং ইউরোপের কোনো কোনো দেশের মতোই আমাদের দেশকেও সুখময় করে তোলা যায়।

আমার পরের চিঠিতে. পৃথিবীর কাহিনী আদিম কালের থেকে বলতে শুরু করব। চমৎকার সেই কাহিনী।

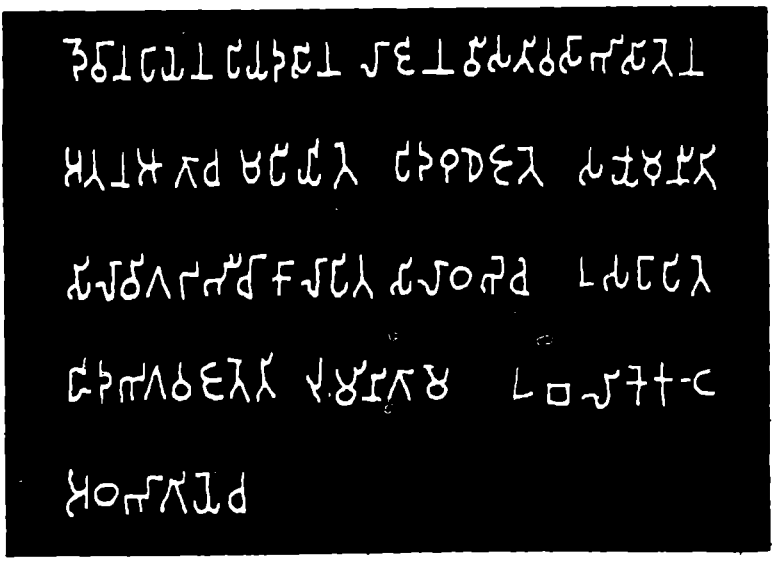

লুম্বিনি থেকে পাওয়া একটি প্রস্তরলিপি

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর জন্ম-কথা

সূর্যের চারদিকে পৃথিবী, আর পৃথিবীর চারদিকে যে চন্দ্র ঘোরে, এ কথা তুমি জানো। পৃথিবীর মতো আরো কতকগুলি পদার্থও যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এ-কথাও হয়তো তোমার জানা আছে। আমাদের পৃথিবী আর ঐ সকল পদার্থকে সূর্যের গ্রহ বলা হয়। চন্দ্রকে বলা হয় পৃথিবীর উপগ্রহ। কারণ, মনে হয়, এ যেন পৃথিবীর কাঁধে ঝুলে আছে। অন্যান্য গ্রহেরও উপগ্রহ আছে। এই সূর্য, আর গ্রহ-উপগ্রহগুলি মিলে, বেশ একটি সুখের পরিবার গড়ে তুলেছে। এ পরিবারটিকে বলা হয় সৌরজগৎ। 'সূর্য' শব্দ থেকে 'সৌর' শব্দটি এসেছে। সূর্যকে বলা যায় এ পরিবারের বাবা, এই জন্যই এদের একসঙ্গে বলা হয় সৌরজগৎ।

রাত্তিরে আকাশে যে অসংখ্য তারকা দেখতে পাও, তাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র গ্রহ, সেগুলিকে অবশ্য তারকা বলা উচিত নয়। আচ্ছা, কোন্‌টা তারকা আর কোন্‌টাই বা গ্রহ কেমন করে তা বোঝা যায়, বলতে পার? এই তারকাগুলির তুলনায় গ্রহগুলিও কিন্তু আমাদের পৃথিবীর মতোই ভারি ছোট, কিন্তু আমাদের বেশি কাছে আছে বলে ওদের একটু বড় দেখায়। যেমন ধর চাঁদ, ওকে তো বলা যায় সৌর পরিবারের ছোট্ট একটি খোকা, কিন্তু আমাদের বেশি কাছে আছে বলে ওকেই সব চেয়ে বড় দেখায়। তারকা আর গ্রহগুলিকে চিনবার আসল উপায় কিন্তু কোন্‌টা মিট্‌মিট্‌ করে তাই দেখা। তারকাগুলিই মিটমিট করে, গ্রহগুলি করে না। সূর্যের কিরণ পায় বলে গ্রহগুলিকে উজ্জ্বল দেখায়। চাঁদ আর গ্রহগুলির গায় সে সূর্যকিরণ পড়ে, সেই প্রতিফলিত কিরণটাই আমরা দেখতে পাই। তারকাগুলি আসলে কিন্তু নিজেরাই এক একটি সূর্য। ওদের গায় গনগনে আগুন জ্বলছে, আর ভারি গরম— তাই ওরা নিজেরাই কিরণ দেয়। সত্যি বলতে আমাদের সূর্যও একটি তারকা, কেবল কাছে কাছে বলেই যা বড় দেখায়, মনে হয় যেন একটা মস্ত আগুনের গোলা।

তবেই দেখ, আমাদের পৃথিবী হল সূর্যপরিবারের অর্থাৎ সৌরজগতের একজন। পৃথিবীকে তো আমরা মস্ত বড় মনে করি। অবশ্য আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষগুলির তুলনায় খুবই বড়, খুব দ্রুতগামী ট্রেন অথবা স্টিমারে চড়ে গেলেও পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে অনেক সপ্তাহ—অনেক মাস—লেগে যায়। কিন্তু আমাদের কাছে একে এত বড় মনে হলেও, আসলে এ আকাশের গায়ে ছোট্ট

www.nagorikpathagar.org

ধূলিকণার মতোই ভেসে আছে। সূর্যই আমাদের কাছ থেকে কয়েক কোটি মাইল দূরে, আর তারকাগুলি তো আরো আরো অনেক দূরে।

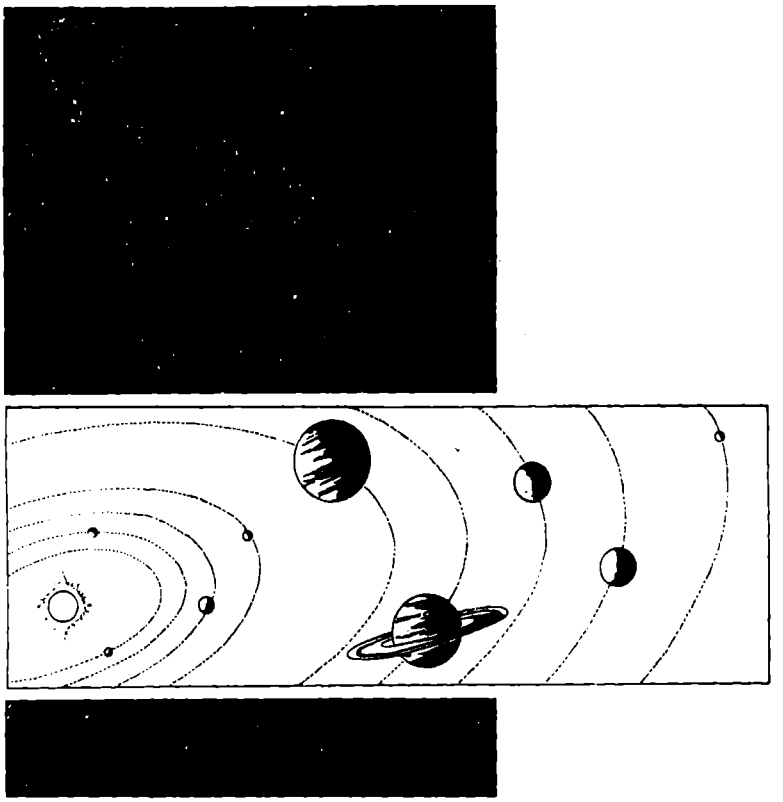

জ্যোতির্বিদরা এই তারকাদের বিষয় নিয়ে অনেক পড়াশুনা আর আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, বহু বহু যুগ আগে এই পৃথিবী আর গ্রহগুলিও ছিল সূর্যের অংশ। আজকের মতো সেদিনেও সূর্য ছিল একটা জ্বলন্ত বস্তু—ভীষণ গরম। যেমন করেই হউক, সূর্যের গা থেকে ছোট ছোট টুকরো সব আল্‌গা হয়ে আকাশের ভিতর ছুটে গেল, কিন্তু সূর্যের শাসন থেকে একদম বেরিয়ে আসতে পারল না। কেমন হল জানো, যেন একটা দড়ি দিয়ে ওদের বেঁধে রাখা হল,আর ওরাও অনবরত সূর্যের চারদিকে ঘুরতে লাগল। এই যে একটা অদ্ভুত শক্তি, যাকে আমি দড়ির সাথে তুলনা করেছি, সেটা সব সময়ই ছোট জিনিসকে বড়র দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ শক্তির বলে সব জিনিস নিচের দিকে পড়ে। আমাদের কাছাকাছি পৃথিবীই হল সবচেয়ে বড় বস্তু, কাজেই পৃথিবী সব জিনিসকে নিজের দিকে টেনে নেয়।

www.nagorikpathagar.org

এমনি করে আমাদের পৃথিবীও যখন সূর্যের শরীর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন এই পৃথিবীও ছিল ভয়ানক গরম, আর তার চারদিকে ছিল ভীষণ গরম গ্যাস আর বাতাস। কিন্তু সূর্যের চেয়ে তো ও অনেক ছোট, কাজেই শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করল। সূর্যও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছে, কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে এর আরো বহু কোটি বৎসর কেটে যাবে। পৃথিবী তার চেয়ে অনেক কম সময়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় পৃথিবী যখন খুব গরম ছিল, তখন অবশ্য এর বুকে মানুষ, জন্তু, গাছপালা কারুরই বাঁচবার যো ছিল না—সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

যেমন সূর্যের এক টুকরো খসে হল পৃথিবী, তেমনি আবার পৃথিবীরও এক টুকরো খসে হল চন্দ্র। কেহ কেহ মনে করেন, আমেরিকা আর জাপানের মধ্যে যে প্রশান্ত মহাসাগরের গর্তটা, পৃথিবী থেকে ঐ অংশটাই খসে গিয়ে হয়েছে চন্দ্র।

তারপর পৃথিবী আরম্ভ করল ঠাণ্ডা হতে—ঠাণ্ডা হতে কিন্তু বহু সময় কেটে গেল। আস্তে আস্তে পৃথিবীর উপরটা ঠাণ্ডা হল, ভিতরটা রয়ে গেল খুব গরম। এখনও যদি তুমি কয়লার খনির নিচে যাও, দেখবে যত নিচে যাবে ততই গরম বোধ করবে। হয়তো পৃথিবীর অনেক নিচে যেতে পারলে দেখা যাবে এখনও সেখানে গন্‌গনে আগুন জ্বলছে। চাঁদও ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করল, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে তো ও অনেক ছোট, কাজেই পৃথিবীর আগে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চাঁদকে দেখে তো মনে হয় ভারি ঠাণ্ডা—না? চাঁদকে বলা হয় 'হিমাংশু'। হয়তো চাঁদের সবটা জুড়ে রয়েছে হিমগিরি আর তুষার-ভূমি।

যখন পৃথিবী যথেষ্ট পরিমাণে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সমস্ত বাষ্প জমে হয়ে গেল জল, আর বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ল পৃথিবীর বুকে। সে-সময় নিশ্চয়ই বৃষ্টির খুব ঘটা হয়েছিল। পৃথিবীর গায় যত গর্ত ছিল সব ভরে গেল; আর তার থেকেই সৃষ্টি হল সব সাগর আর মহাসাগরের।

যখন পৃথিবীর উপরটা, আর সমুদ্রের জল, বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তখনই পৃথিবীর বুকে আর সমুদ্রের জলে, জীব জন্তুর বেঁচে থাকা সম্ভব হল। পরের চিঠিতে, প্রাণের সূচনা কেমন করে হল সেই কথা বল্‌ব।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণের সূচনা

আগের চিঠিতে তোমাকে বলেছি, পৃথিবী অনেক কাল ধরে এত গরম ছিল যে কোন প্রাণীরই সেসময় বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। এখন প্রশ্ন করতে পার, পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা হল কবে থেকে, আর সৃষ্টির আদিম প্রাণীই বা ছিল কী রকম? প্রশ্নটা যেমন সুন্দর, উত্তরটা আবার তেমনি কঠিন। আচ্ছা দেখা যাক্, প্রাণ বলতে কী বুঝায়। তুমি হয়তো বলবে, বা রে! এই যে মানুষ আর জন্তু জানোয়ার দেখছি, এরাই তো সব জ্যান্ত প্রাণী। তবে গাছপালা, শাক, সবজি, পাতা, ফুল—এরা কী? এদেরও কিন্তু প্রাণ আছে, এরাও প্রাণী। এরা জল আর জন্তুর মধ্যে মাত্র এইটুকু তফাত যে গাছ ঘুরে বেড়ায় না। লন্ডনের কিউ গার্ডেনে (Kew garden) তোমাকে যে কয়েকটা ছোট ছোট চারা গাছ দেখিয়েছিলাম, হয়তো তোমার এখনও মনে আছে। ঐ অর্কিড, পিচারের ছোট্ট গাছগুলি কিন্তু সত্যি সত্যি পোকা ধরে খায়। সমুদ্রের নিচে যে স্পঞ্জ রয়েছে ওরাও আবার এক রকমের প্রাণী, কিন্তু ঘুরে বেড়ায় না। আবার এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে, যাদের প্রাণী বলব, কী গাছ বলব, বোঝাই মুশকিল। যখন তুমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান আর প্রাণীবিজ্ঞান পড়বে, তখন এমন অনেক পদার্থের কথা শিখবে, যাদের ঠিক ঠিক না বলা যায় প্রাণী, না বলা যায় উদ্ভিদ। কেউ কেউ তো বলেন পাথরের ও প্রাণ আছে, ওদেরও এক রকমের ব্যথা বোধ আছে—চোখে অবশ্য দেখা যায় না। জেনেভায় যখন আমরা ছিলাম সেখানে এক ভদ্রলোক যিনি আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তোমার হয়তো মনে আছে—উনিই আমাদের স্যার জগদীশ বসু। তিনি তো পরীক্ষা করেই দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদের প্রাণ আছে; আর পাথরেরও যে এক রকমের প্রাণ আছে, এও তিনি বিশ্বাস করেন।

কাজেই দেখ, কাদের প্রাণ আছে, আর কাদের যে নেই, তা ঠিক করে বলা মুশকিল। যাক, পাথরের কথা না হয় ছেড়েই দিই, উদ্ভিদ আর প্রাণীর কথাই ধরা যাক। চোখের সামনে তো আমরা নানারকমের অসংখ্য প্রাণী দেখছি। প্রথম ধর মানুষ—তাদের কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা। তারপর ধরো জন্তু জানোয়ার—এদের মধ্যেও কতকগুলি আছে বেশ বুদ্ধিমান, আবার কতকগুলি আছে ভারি বোকা। হাতি, বানর, পিঁপড়া এরা তো বেশ বুদ্ধিমান, আবার মাছ এবং ঐ জাতীয় আরো কতকগুলি সামুদ্রিক প্রাণী আছে, সেগুলি একেবারে নিম্নস্তরের জীব। আর তারও

www.nagorikpathagar.org

নিচের ধাপে রয়েছে স্পঞ্জ ও জেলি মাছ, আর একেবারে শেষের দিকে কতকগুলি আছে, যাদের বলা যায় অর্ধেক প্রাণী, অর্ধেক উদ্ভিদ।

এখন দেখতে হবে, এই সব নানা রকমের জীব কী একই সময়ে হঠাৎ জন্ম নিয়েছে, না আস্তে আস্তে একটির পর একটির জন্ম হয়েছে। কেমন করে এর জবাব পাই বল তো? সেই আদিম যুগের লেখা কোনো বই তো আর আমাদের কাছে নেই। তবে? তোমাকে যে বলেছিলাম প্রকৃতি দেবীর নিজের হাতের লেখা একখানা বই আছে, তোমার কী মনে হয় যে সেই বইখানা আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারে? সত্যি, ঐ বইখানার ভিতরই আমাদের জবাব মিলবে। পুরানো প্রস্তরের ভিতর নানা রকমের জীব জন্তুর হাড় পাওয়া যায়, যাদের বলা হয় 'ফসিল্' (Fossil)। এইসব প্রস্তরের গঠন হয়েছে বহু বহু যুগ আগে, কাজেই বলা যায়, যেসব প্রাণীর ফসিল্ এই সব প্রস্তরের ভিতর পাওয়া যায়, সেই আদিম যুগে, যখন ঐ প্রস্তরের গঠন হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই সেই সব প্রাণীও বেঁচে ছিল। লন্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামে তো তুমি ছোট বড় নানা রকমের 'ফসিল্' দেখেছ।

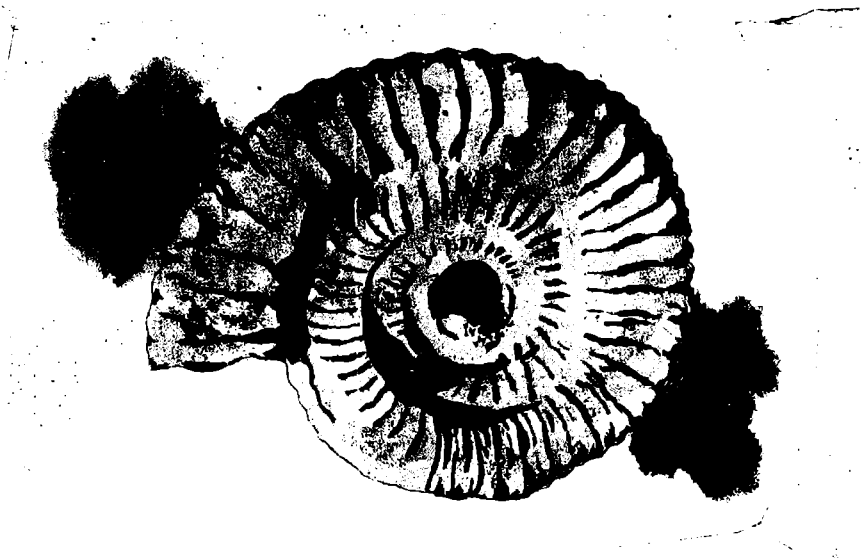

যখন কোনো প্রাণী মরে যায়, তার নরম মাংসটা শীঘ্রই পচে নষ্ট হয়ে যায়; হাড়গুলি কিন্তু বহুদিনেও নষ্ট হয় না। সেই হাড়গুলিই আমাদিগকে প্রাক্তন যুগের প্রাণীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু হাড় নাই এমন প্রাণীও আছে, যেমন 'জেলি ফিস্'। এ যখন মরে যায়, অস্তিত্বের কোনো প্রমাণই এ অবশ্য রেখে যায় না।

পৃথিবীটা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর এক একটা মৃত্তিকাস্তর গঠিত হয়েছে। সেই সব বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর সংগ্রহ করে যদি ভালো করে পরীক্ষা করা যায়, তবে বেশ সহজেই বোঝা যাবে, বিভিন্ন রকমের প্রাণী বিভিন্ন যুগে বেঁচে

www.nagorikpathagar.org

ছিল—শূন্য থেকে সবাই মিলে একদিনে জন্ম নেয়নি। প্রথমে শামুকের মতো খোসাঅলা খুব শাদাসিধা গঠনের এক রকমের প্রাণী ছিল। সমুদ্রের তীরে যে তুমি সুন্দর সুন্দর নানারকমের ঝিনুক কুড়িয়েছ, ওরা সব ঐ মৃত প্রাণীদের বাইরের শক্ত খোসা। এর পরের যুগের যেসব প্রাণী,—যেমন সাপ, অতিকায় হস্তি, আর বর্তমান যুগের সগোত্র নানা রকমের পশুপাখি, এদের গঠন আরেকটু গোলমেলে। সর্বশেষ যুগে আমরা পাই মনুষ্যের কঙ্কাল। কাজেই মনে হয়, এই জীবসৃষ্টির একটা ক্রমিক রীতি আছে। সর্বপ্রথমের সৃষ্টি অতি সাধাসিধা ধরনের প্রাণী, তারপর ক্রমেই জটিল গঠনের উচ্চতর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে; শেষ ধারায় সৃষ্টি হয়েছে মানুষের, মানুষ হল বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ট জীব। কেমন করে যে অতি সাধারণ গঠনের স্পঞ্জ, শামুক আস্তে আস্তে পরিণতি লাভ করে উন্নত, হল, তার বিবরণ ভারি চমৎকার। তা তোমাকে আর একদিন বলব। আজ কেবল সৃষ্টির আদিম প্রাণীর কথাই বলব।

পৃথিবী যখন আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সে-দিনকার প্রথম জীব হয় তো ছিল জেলির মতো নরম থল্‌থলে এক রকমের সামুদ্রিক পদার্থ, তাদের না ছিল খোসা, না ছিল হাড়। এই কঙ্কালহীন দেহের তো ফসিল থাকতে পারে না, কাজেই এদের বিষয় আমাদের কতকটা আন্দাজ করেই বলতে হয়। জেলির মতো এ-রকম সামুদ্রিক প্রাণী কিন্তু আজকালও পাওয়া যায়। এদের আকৃতি গোল, কিন্তু খোসা অথবা হাড় নেই, কাজেই আকৃতিটা অনবরতই বদলে যাচ্ছে। কতকটা এ-রকম—

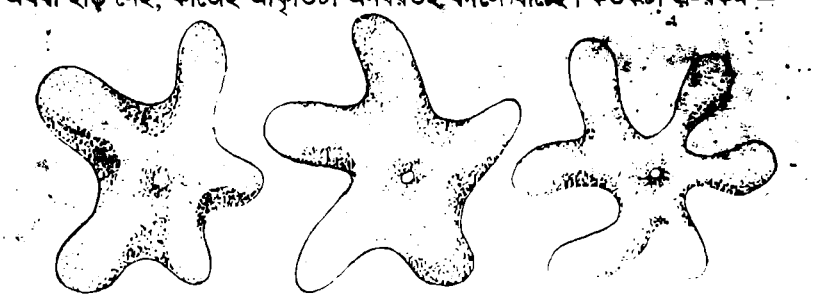

মাঝখানে যে একটা ফুট্‌কি রয়েছে তা লক্ষ কর। এটাকে ইংরেজিতে বলে 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus), কতকটা হৃদ্‌পিণ্ডের মতো। এদের প্রাণীই বল আর যাই বল, দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এদের প্রকৃতির একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব। হয় কী জানো, এক জায়গায় সরু হতে হতে এরা ছিন্ন হয়ে যায়, প্রত্যেক ভাগই কিন্তু প্রথমটার মতোই থল্‌থলে। নিচে দেখ কেমন করে এরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে—

www.nagorikpathagar.org

একটা জিনিস লক্ষ্য কর—হৃদ্‌পিণ্ডটাও দুভাগে বিভক্ত হয়ে এক এক অংশ এক এক ভাগে যুক্ত হয়েছে। এমনি করে এই প্রাণীগুলি বিভক্ত হয়ে বেড়েই যাচ্ছে।

আমাদের পৃথিবীতে এই রকম প্রাণীর প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। জীবনের কী সহজ, শাদাসিধা প্রতীক। পৃথিবীতে তখন এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এর চেয়ে পরিণত আর কোনো প্রাণীই ছিল না। ঠিক ঠিক জীব-সৃষ্টি তখন পর্যন্তও হয় নাই, আর মানুষের জন্ম হতে তো তখনও আরো বহু লক্ষ বৎসর বাকি ছিল।

এই জেলির পরের ধাপে এল সামুদ্রিক ঘাস, শামুক, কাঁকড়া পোকা। তার পরের ধাপে এল মাছ। এদের বিষয় কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানি, কারণ মরণের পর এরা রেখে গেছে এদের কঙ্কাল আর শক্ত খোসা। আজ বহু যুগ পরে সেসব কঙ্কালের খোঁজ পেয়েছি বলেই, তাদের বিষয় আমরা আলোচনা করছি। সমুদ্রের নিচে কাদার ভিতর তাদের কঙ্কাল আর খোসাগুলি পড়েছিল। নূতন নূতন কাদা আর বালুস্তরের নিচে ওরা যত্নে ঢাকা পড়ে রইল। নিচের কাদাটা উপরের বালু আর কাদার চাপে শক্ত হয়ে গেল। শক্ত হতে হতে শেষে পাথর হয়ে গেল। এ রকম করেই সমুদ্রের নিচে পাষাণ-মৃত্তিকা গড়ে উঠল।

হয়তো একদিন ভূমিকম্পে অথবা অন্য কোনো কারণে সমুদ্রের নিচের পাষাণস্তর মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এল, আর সেই সাথে সাথে দেখা দিল শুকনো মাটি। তরপর সেই শক্ত পাষাণস্তর নদী আর বৃষ্টির জলে ধুইয়ে ধুইয়ে ক্ষয় হয়ে গেল। আর সেই কঙ্কালটা, যা নাকি বহু যুগ ধরে পাষাণের ভিতর লুকিয়ে ছিল, সেটাও এক দিন বেরিয়ে এল। সেই ফসিলটাকে কেউ একদিন আবিষ্কার করল, আর সেটাকে পরীক্ষা করে, মানুষ জন্মাবারও বহু যুগ আগে পৃথিবীটা কেমন ছিল, তারই ইতিহাস ঠাওর করে নিল। এই সহজ প্রণালীর প্রাণীগুলি যে কেমন করে আজকের দিনের পরিণত অবস্থা লাভ করেছে, তারই কথা এর পরের চিঠিতে লিখব।

www.nagorikpathagar.org

প্রাণীর আবির্ভাব

বলেছি তো তোমাকে, পৃথিবীর প্রথম প্রাণী ছিল হয়তো ছোট ছোট সরল গঠনের সামুদ্রিক জীব, আর জলীয় ঘাস। এদের কেবল জলের মধ্যেই বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, যদি কখনও ডাঙ্গায় উঠে আসত, তবে শুকিয়ে মরে যেত। দেখেছ তো, জেলি মাছ সমুদ্রের পারে এসে আটকে গেলে কেমন করে শুকিয়ে যায়? সেদিনে জল আর জলাভূমি ছিল বিস্তর, আজকালকার দিনের চেয়ে তো নিশ্চয়ই খুব বেশি। এসব জেলি মাছ আর সামুদ্রিক জীবগুলির মধ্যে যাদের আবরণটা ছিল একটু শক্ত, তাদেরই শুকনো মাটিতে বেশি সময় বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল, কারণ, সেগুলি খুব সহজেই শুকিয়ে যেত না। এমনি করে পাতলা আবরণের প্রাণীগুলির সংখ্যা ক্রমেই কমতে লাগল; আর যাদের আবরণটা ছিল একটু শক্ত তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এই প্রণালীটার ভিতর লক্ষ্য করবার জিনিস হল এই, সব প্রাণীকেই পারিপার্শ্বিকের সাথে আপোশ করে বেঁচে থাকতে হয়, তাই পারিপার্শ্বিকের অনুকূলে তার আকৃতিরও পরিবর্তন হয়।

লন্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামে দেখেছ, যে-সব শীতের দেশে খুব বরফ পড়ে, সেসব দেশের পশুপাখির গায়ের রং, বরফের মতো ধব্‌ধবে শাদা। আবার যেসব গরম দেশে যথেষ্ট সবুজ ঘাস আর গাছ আছে, সেসব দেশের পশুপাখির গায়ের রং সবুজ, অথবা আর কোনো খুব উজ্জ্বল রং। এরকম রং পরিবর্তনের কারণ আর কিছুই নয়, পশুপাখি সব প্রাণীই চায়, নিজেদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে। তাই চারদিকের সাথে নিজেদেরও মিলিয়ে নেয়; কারণ চারদিকের সাথে গায়ের রং মিলে গেলে আর কোনো শত্রু তাদের দেখতে পাবে না। শীতের দেশের প্রাণীদের গায়ে যে লোম হয়, তারও এই কারণ—শীতের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা। আবার দেখ, বাঘের জন্ম রোদের দেশে, তার গায়ে থাকে হলদে ডোরা ডোরা দাগ; হলদে দাগুলিকে মনে হয় যেন, বন-জঙ্গলের ভিতর গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদের আলো। বাঘের পক্ষে এই হলদে ডোরা দাগের প্রয়োজনীয়তা হল শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। গায়ে হলদে ডোরা দাগ থাকার দরুন গভীর জঙ্গলের ভিতর বাঘকে দেখতে পাওয়া মুশকিল। এই যে, সমস্ত প্রাণীর পারিপার্শ্বিকের সাথে বর্ণ-সাম্য, আর প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী দেহের সংস্কার, এটা কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে একটা মস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। অবশ্য প্রাণীগুলি যে নিজেরাই চেষ্টা করে এই পরিবর্তন এনেছে, অথবা আনতে পারে, তা নয়। আসল

www.nagorikpathagar.org

কথা, যাদের এই পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের সাথে যারা অনুকূলিত হতে পারে, তারাই বাঁচবার সুযোগ পায় বেশি। কাজেই তাদের সংখ্যা বেড়ে যায়, অন্যগুলির বাড়ে না। এই প্রাকৃতিক নিয়মটা মনে রাখলে, অনেক ঘটনাই আমাদের বোঝা সহজ হবে। জীব-জগতের নিম্নতর প্রাণী যে কেমন করে উচ্চতর প্রাণীতে পরিণত হল, আর কেমন করেই বা লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্তনের ফলে মানুষের সৃষ্টি হল, তা-ও বুঝতে পারব। এই পরিবর্তনটা কিন্তু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না, কারণ পরিবর্তনটা হয় যেমন অতি ধীরে, আমাদের বেঁচে থাকবার মেয়াদও আবার তেমনি বড় কম। কিন্তু প্রকৃতি তার এই পরিবর্তন আর সংস্কারের কাজ করেই যাচ্ছেন—মুহূর্তের তরেও তাঁর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

এখন মনে রেখো, পৃথিবী আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা আর শুকনো হয়ে আসছিল। পৃথিবী যেমন ঠাণ্ডা হতে লাগল, এর আবহাওয়ারও তেমনি পরিবর্তন হতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব জিনিসেরও। পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী জগতেও পরিবর্তন আরম্ভ হল, আর নূতন নূতন প্রাণীরও উদ্ভব হতে লাগল। সৃষ্টির প্রথম যুগে যেসব অতি সাধারণ সামুদ্রিক প্রাণী ছিল, তারাই ক্রমপরিবর্তনের ফলে উচ্চতর পরিণতি লাভ করেছে। শুকনো ডাঙা ক্রমে যতই বেশি হতে লাগল, কুমির আর ব্যাঙের মতো সব প্রাণীরও সৃষ্টি হতে লাগল—তারা ডাঙায়ও থাকত, জলেও থাকত। তারপর সৃষ্টি হল স্থলচর প্রাণীর, আর সকলের পরে সৃষ্টি হল আকাশচারী বিহঙ্গের।

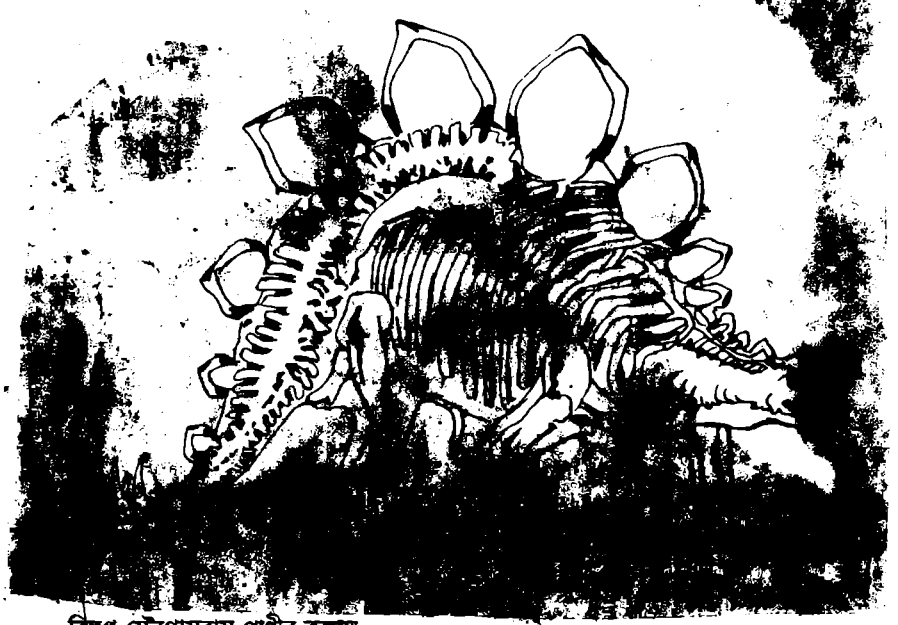

বিলুপ্ত স্টেগোসরাস প্রাণীর কঙ্কাল

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আমি ব্যাঙের কথা এখানে বললাম এই কারণে যে, এর জীবন থেকে একটা মজার জিনিস শিখবার আছে। কেমন করে যে জলচর প্রাণী স্থলচর হল, ব্যাঙের জীবন-ইতিহাস থেকে তা বোঝা যায়। প্রথম ব্যাঙাচি অবস্থায় একে বলা যায় জলচর মাছ, পরের অবস্থায় এ হয় স্থলচর প্রাণী। অন্যান্য স্থলচর প্রাণীর মতই এ-ও তখন ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়।

সেই আদিম যুগে স্থলচর প্রাণীর যখন প্রথম আবির্ভাব হল, তখন পৃথিবী জুড়ে ছিল বড় বড় বন আর জঙ্গল। মাটি ছিল তখন জলা আর তার উপর ছিল ঘন বন। এই বনগুলি আস্তে আস্তে মাটির নিচে ঢাকা পড়ে গেছে, আর পাথর আর মাটির চাপে হয়ে গেছে কয়লা। জানোই তো, মাটির অনেক নিচে খনির ভিতর কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লার খনি কিন্তু সেই আদিম যুগের বনজঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে যাদের প্রথম আবির্ভাব হল সেগুলি ছিল অতিকায় সাপ, গিরগিটি, আর কুমির। এদের কোনো কোনোটা ছিল ১০০ ফিট লম্বা। একশো ফিট লম্বা এক একটা সাপ গিরগিটির কথা ভাবতে কেমন লাগে? তোমার হয়তো মনে আছে লন্ডন মিউজিয়ামে ঐ সব অতিকায় প্রাণীদের কঙ্কার দেখেছ।

তার পরের যুগের জন্তুগুলি দেখতে ছিল অনেকটা আমাদের বর্তমান যুগের জন্তুগুলির মতোই। এদের বলা হয় স্তন্যপায়ী, কারণ এরা এদের সন্তানদের স্তন্য পান করায়। এরাও প্রথম অবস্থায় এখনকার চেয়ে অনেক বড় ছিল। স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে বানর আর মানুষে সবচেয়ে সাদৃশ্য বেশি। মানুষ কিন্তু বানরের বংশধর বলেই অনেকের বিশ্বাস। এর অর্থ বুঝলে তো? প্রত্যেক প্রাণীই প্রকৃতির সঙ্গে আপোশ করে করে যেমন উন্নত হয়েছে, বানরও তেমনি উন্নত হতে হতে একদিন মানুষ হয়েছে। প্রকৃতির হাতে এই সংস্কারের কাজ নিত্যই চলছে। মানুষ তো আজ অনেক বড়ো, তার এই উন্নতির আর শেষ নেই। মানুষ পশুর চেয়ে নিজেকে কত ভিন্ন বলে করে, কিন্তু মনে রাখা ভালো বানর, বনমানুষ, আর আমরা, এক বংশেরই জ্ঞাতিভাই। তোমার কানে কানে আরও বলি, অনেক মানুষ ব্যবহারে আজকের দিনেও ঠিক বানরের মতোই রয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

ঊষা-মানব

তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি, পৃথিবীতে প্রথমে যে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, তা ছিল অতি সাদাসিধা গঠনের, আর সেটাই বহু লক্ষ যুগের পরিবর্তনের ফলে আজকের আকৃতি লাভ করেছে। প্রাণীর এই ক্রমবিবর্তনের একটা প্রধান নিয়ম আমরা লক্ষ্য করেছি—সব প্রাণীই প্রকৃতির সঙ্গে আপোশ করবার চেষ্টায় আছে। এই চেষ্টার ফলে তারা নূতন নূতন গুণের অধিকারী হয়েছে, উন্নততর হয়েছে, আর আকৃতিও হয়েছে ক্রমেই জটিল। এই পরিবর্তন অথবা উন্নতির ধারাটা কিন্তু আরো অনেক রকমে বোঝা যায়। যেমন ধর, সর্ব প্রথমে যখন কঙ্কালহীন প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, বেশি দিন ওদের বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না, কাজেই আস্তে আস্তে ওদের দেহের সাথে একটা হাড় জুড়ে গেল—মেরুদণ্ড। কাজেই আমরা পেলাম, প্রাণীর দুইটি শ্রেণী—সকঙ্কাল আর অকঙ্কাল। মানুষ আর তোমার চারদিকে যেসব জন্তু দেখছ তারা সবই সকঙ্কাল।

এখন তোমাকে অণ্ডজপ্রাণী থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত ক্রমোন্নতির ধারাটা বোঝাতে চেষ্টা করব। প্রথম ধর মাছ এবং আরো কতকগুলি সহজ গঠনের প্রাণীর কথা, যারা ডিম পাড়ে। এই নিম্ন স্তরের প্রাণীগুলি এক-একবারে অনেকগুলি করে ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম পেড়ে ডিমগুলির যত্ন নেয় না। ভারি আশ্চর্য, সন্তানের ওপর মার মায়া নেই! মৎস্যমাতা ডিম পেড়ে ডিমগুলির দিকে আর ফিরেও তাকায় না। দেখবার কেউ নেই, কাজেই বেশির ভাগ ডিম নষ্ট হয়ে যায়; আর বাকিগুলি মাছ হয়ে ফুটে বের হয়। প্রকৃতির রাজ্যে এ একটা মস্ত অপচয়। এর পরে প্রাণী-শ্রেণীর যতই উপরে উঠবে, ততই দেখবে তারা কম ডিম পাড়ে, আর কম সন্তান প্রসব করে, কিন্তু মা ওদের বেশ যত্ন নেয়। যেমন ধর মুরগিও ডিম পাড়ে, ডিমে তা দেয়, তারপর বাচ্চাটা বেরিয়ে এলে কিছুদিন ওকে যত্ন করে খাওয়ায়; অবশ্য বাচ্চাটা বড় হয়ে গেলে আর বিশেষ একটা যত্ন নেয় না।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর কথা এর আগের চিঠিতে তোমাকে একটু লিখেছি। এরা অণ্ডজ প্রাণীদের চেয়ে উন্নত, আর এদের মধ্যে একটা মস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়,—এসব প্রাণী ডিম প্রসব করে না। মা ডিমটা পেটের মধ্যে রেখে দেয়, তারপর পূর্ণ পরিণত একটি বাচ্চা প্রসব করে, যেমন —কুকুর, বিড়াল, খরগোশ। বাচ্চাগুলিকে মা বুকের দুধ খাওয়ায়, যত্নও নেয় বেশ। এই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও অপচয়টা কিন্তু খুব দেখা যায়। খরগোশের কথাতো জানো, ওরা কয়েক মাস অন্তর অন্তর

www.nagorikpathagar.org

অনেকগুলি করে বাচ্চা দেয়, কিন্তু তার মধ্যে আবার কতকগুলি মরে যায়। হাতি এদের চেয়ে আবার আরেকটু উঁচু স্তরের জন্তু। এ কিন্তু একবার মাত্র একটা বাচ্চাই প্রসব করে, আর বাচ্চাটার খুব যত্ন নেয়।

কাজেই দেখছ, উন্নত স্তরের প্রাণী ডিম পাড়ে না, একেবারেই পরিণত কতকগুলি বাচ্চা প্রসব করে, আরেকটা উঁচু স্তরের যে গুলি তারা একবারে একটির বেশি বাচ্চা প্রসব করে না। এ বিষয়টিও লক্ষ্য কর,—যে প্রাণী যত উন্নত, সন্তানের প্রতি ভালোবাসাও তার তত বেশি। মানুষ হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, তাই দেখ মানুষের বাপমা সন্তানদের কত ভালোবাসে, কত যত্ন নেয়।

এখন হয়তো, তুমি বুঝতে পেরেছ, কেমন করে নিম্নস্তরের প্রাণীর থেকে উন্নত হতে হতে আজকের দিনের শ্রেষ্ঠ মানুষের পরিণতি সম্ভব হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম মানুষ হয়তো আজকের দিনের মানুষের মতো মোটেই ছিল না। খুব সম্ভব, তারা ছিল অর্ধ-নর অর্ধ-বানর; আর তাদের বসবাসের রীতিটাও হয়তো ছিল বানরের মতোই। জার্মানির হাইডেলবার্গ শহরে এক অধ্যাপকের সাথে দেখা করেছিলাম, তোমার বোধ হয় মনে আছে। তিনি নানা রকমের 'ফসিলে' ভরা একটি ছোট্ট মিউজিয়াম আমাদের দেখিয়েছিলেন। সেখানে একটা নরমুণ্ড ছিল; সেটা মানুষ সৃষ্টির আদিম যুগের একটা নরমুণ্ড বলে সকলের ধারণা। তিনি তো খুব যত্ন করে ওটাকে সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছিলেন। এ নরমুণ্ডটা হাইডেলবার্গের নিকট মাটির নিচে পাওয়া গেছে, তাই ওটাকে বলা হয় 'হাইডেলবার্গ-মানুষ' (Heidelberg Man); অবশ্য হাইডেলবার্গ অথবা এমন কোনো শহর আর সেদিনে নিশ্চয়ই ছিল না।

সেই প্রাচীন যুগে মানুষ ঘুরে ঘুরে বেড়াত, পৃথিবীটা ছিল ভারি ঠাণ্ডা। সেই সময় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এত বরফ ছিল যে সেই যুগটাকে বলা হয় 'তুষার যুগ'। আজকাল উত্তর মেরুতে যেরকম সব তুষারনদী রয়েছে, সে রকম তুষারনদী সে-দিনে ইংল্যান্ড, জার্মানি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেদিনকার জীবন যাত্রা মানুষের পক্ষে ছিল বড় কষ্টের, ওটা মানুষের ছিল বড় দুঃখের সময়। পৃথিবীর যেসব স্থানে তুষারনদী ছিল না, কেবল সেই সব স্থানেই তাদের বাস করা সম্ভব ছিল।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আজকের ভূমধ্যসাগর সেদিনে মোটেই সাগর ছিল না—ওখানে ছিল কেবল গোটা দুই হ্রদ। লোহিত সাগর তো ছিলই না। সমস্তটা জুড়ে ছিল ডাঙা। ভারতবর্ষের অধিকাংশই ছিল তখন একটা দ্বীপ। পাঞ্জাব আর যুক্তপ্রদেশের অনেকটা সমুদ্রের মধ্যে ছিল। ভেবে দেখ তো কেমন মজা — দক্ষিণভারত আর মধ্যভারত মিলে হয়েছে একটা দ্বীপ, আর হিমালয় থেকে ওকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে একটা সাগর। সেদিনে মুসৌরি যেতে হলে কিন্তু তোমাকে খানিকটা স্টীমারে করে যেতে হতো।

আদিমানব পৃথিবীতে যেদিন প্রথম চোখ মেলে চেয়েছিল, সে দেখতে পেল তার চারদিকে সব অতিকায় জন্তু—ভয়ে ভয়ে তখন সে দিন কাটাত। আজ অবশ্য পৃথিবীতে মানুষ হয়েছে প্রভু, আর পৃথিবীর যত সব জন্তু তারা তার দাস। ঘোড়া, গরু, হাতি, কুকুর, বিড়াল এরা মানুষের গৃহপালিত পোষা জন্তু। বনের বাঘ, সিংহকে

www.nagorikpathagar.org

সে শিকার করে আনন্দ পায়, আবার কোনো কোনো পশুকে সে মেরে খায়। সেই আদিম যুগে কিন্তু মানুষ প্রভু ছিল না, বরং সে ছিল শিকার, বড় বড় জন্তু জানোয়ারের ভয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে ফিরত। ধাপে ধাপে মানুষ উন্নত হল, আস্তে আস্তে সে শক্তিমান হল, আর আজ দেখ সব প্রাণীর চাইতেই মানুষ বেশি শক্তিশালী। কেমন করে এ সম্ভব হল বলতো? গায়ের জোরে নিশ্চয়ই নয়, কারণ, হাতির জোর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। তবে? মানুষ তার বুদ্ধি আর মস্তিষ্কের জোরেই এতো উন্নত হয়েছে।

সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ধারাটা আমরা জানি। বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে ভিন্ন করেছে। বুদ্ধিহীন মানুষ আর পশুতে কী তফাত বল?

আগুন জালাতে পারা মানুষের সর্বপ্রথমের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। আজকাল আমরা দিয়াশলাই দিয়ে আগুন জ্বালি। এই দিয়াশলাই কিন্তু খুব বেশি দিনের আবিষ্কার নয়। প্রাচীন যুগে দুখানা পাথর ঘসে একটা আগুনের ফুল্‌কি বের করা হত, সেই ফুল্‌কির আগুনে শুক্‌নো খড়কুটা ধরে বড় একটা আগুন জ্বালানো হত। পাথর অথবা অন্যান্য জিনিসের ঘষায় বনের ভিতর অনেক সময় আপনা থেকেই আগুন জ্বলে উঠে। এর থেকে কিছু শেখার মতো বুদ্ধি অবশ্য পশুদের ছিল না। মানুষ তো পশুর চেয়ে বুদ্ধিমান, তাই সে সহজেই আগুনের উপকারিতা বুঝল। শীতের দিনে শরীর গরম করবার, আর যে সব বড় বড় জন্তু ছিল তাদের শত্রু, ওদেরও ভয় দেখিয়ে তাড়াবার একটা উপায় মানুষ খুঁজে পেল। কাজেই যখনই কোনো রকমে একটা আগুন জ্বলে উঠত, সবাই মিলে চেষ্টা করত শুকনো পাতা ফেলে ঐ আগুনটাকে জ্বালিয়ে রাখতে। আগুনটাকে নিভতে দিতে কেহই চাইত না। আস্তে আস্তে অবশ্য তারা নিজেরাই শিখে নিল, কেমন করে দুখানা পাথর ঘষে আগুন জ্বালাতে হয়। এই মহান আবিষ্কারের ফলে পশুদের ওপর তার একটু আধিপত্য হল—পৃথিবী জয়ের প্রথম সন্ধান সে পেল।

www.nagorikpathagar.org

প্রস্তর-যুগ ও সেই যুগের মানুষ

আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে পশুর চেয়ে ভিন্ন করেছে। এই বুদ্ধিই তাকে চতুর করেছে, শক্তিশালী করেছে, আর এই বুদ্ধিই অন্যান্য অতিকায় পশুর কবল থেকেও তাকে রক্ষা করেছে। মানুষের বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার এই প্রভুত্বও বেড়েছে। প্রথম অবস্থায় তো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবার মতো কোনো অস্ত্র তার হাতে ছিল না—কেবল পাথর ছুঁড়েই সে যুদ্ধ করত। তারপর মানুষ পাথর দিয়ে কুড়ুল, বর্শা—এসব অস্ত্র, আর সরু সূঁচ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করতে আরম্ভ করল। জেনিভা এবং সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামে এরকম পাথরের অস্ত্র আমরা অনেক দেখেছি।

আমার আগের চিঠিতে যে তুষারযুগের কথা বলেছি, আস্তে আস্তে তার শেষ হয়ে এল। মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের তুষারনদীগুলি আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে পৃথিবীর আবহাওয়ার উষ্ণতাও বাড়তে লাগল, আর মানুষও পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সেদিনে অবশ্য বাড়ী, দালান-কোঠা কিছুই ছিল না—মানুষেরা বাস করত গুহার ভিতর। কৃষি অথবা মাঠের কাজ তাদের জানা ছিল না; ফল, বাদাম, আর শিকারকরা পশুর মাংস খেয়েই তারা জীবন ধারণ করত। মাঠে তো শস্য জন্মাত না, কাজেই ভাত আর রুটি তাদের খাদ্যের মধ্যে ছিল না। রান্না করতে আর তারা জানত না, রান্নার বাসনকোসনও তাদের ছিল না—খাবার আগে মাংসটাকে হয়তো একটু আগুনে সেঁকে নিত।

এটা কিন্তু ভারি আশ্চর্যের বিষয়, এই আদিম যুগের অসভ্য মানুষেরা আঁকতে জানত। তাদের চিত্রাঙ্কনের কাগজ, পেন্সিল, কলম, তুলি এসব অবশ্য কিছুই ছিল না; থাকবার মধ্যে ছিল কেবল পাথরের সূঁচ আর সরু সরু যন্ত্র। এ দিয়েই তারা গুহার গায়ে ছবি আঁকত, আর নানা রকমের দাগ কাটত। মাঝে মাঝে দেখা যায় এক একটা ছবি বেশ সুন্দর, তবে বেশির ভাগ ছবিই রেখাঙ্কন। এরকম রেখাচিত্র আঁকা সহজ, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এরকম ছবিই আঁকে। গুহাগুলি তো নিশ্চয়ই খুব অন্ধকার, কাজেই মনে হয় শাদাসিধা ধরণের কোনো রকমের প্রদীপ অথবা মশাল ওরা ব্যবহার করত

যেসব মানুষের গল্প তোমাকে বললাম তাদের বলা হয় Palaeolithic অর্থাৎ আদিপ্রস্তর যুগের মানুষ। এটাকে প্রস্তর-যুগ বলা হয়— কেন না, মানুষ সেদিনে

www.nagorikpathagar.org

কেবল পাথরের ব্যবহারই জানত, আর পাথর দিয়েই তাদের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত। ধাতুর ব্যবহার তারা জানত না। আজকের দিনে আমাদের বেশীর ভাগ জিনিসই ধাতুর তৈরি, বিশেষত লোহার। লোহা পিতলের ব্যবহার ঐ যুগের মানুষ জানত না, কাজেই পাথর দিয়ে কাজ করা কঠিন হলেও পাথরই ব্যবহার করা হত।

গুহাচিত্র

এই প্রস্তর-যুগ শেষ হবার আগেই পৃথিবীর আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন হল, পৃথিবীও অনেকটা উষ্ণ হল। তুষারনদীগুলি বহু দূরে আর্কটিক সাগর পর্যন্ত সরে গেল, আর মধ্য এশিয়া ও ইউরোপ খণ্ডে দেখা দিল মস্ত মস্ত বন জঙ্গল। এই বনগুলির মধ্যেই আরেক নূতন জাতির মানুষের বসবাস আরম্ভ হল। আদিপ্রস্তর-যুগের (Palaeolithic) মানুষের চেয়ে এরা অনেক বুদ্ধিমান। কিন্তু এরাও পাথর দিয়েই তাদের যন্ত্রপাতি তৈরি করত। এরাও প্রস্তর যুগের মানুষ। তবে এদের বলা হয় Neo-lithic অর্থাৎ নবপ্রস্তর-যুগের মানুষ।

এই নবপ্রস্তর-যুগের মানুষদের পরীক্ষা করলে দেখা যায়, মানুষ এত দিনে আরো অনেক উন্নতি করেছে। অন্যান্য পশুদের তুলনায় এই মানুষদের বিশিষ্ট বুদ্ধি, তাদের অনেক তাড়াতাড়ি উন্নতির পথে এগিয়ে দিল। প্রস্তর যুগের এই নব পর্যায়ের মানুষেরাই প্রথম কৃষির উদ্ভাবন করে। মাটি চাষ করে তারা শস্য জন্মাতে লাগল। সেই যুগের মানুষের পক্ষে এটা একটা মস্ত ঘটনা। খাদ্যের জন্য সব সময় শিকারের চেষ্টা না করে, খাদ্য তারা আরো সহজেই পেতে লাগল। বিশ্রাম আর চিন্তা করবার প্রচুর অবকাশও তারা পেল। আর এই অবকাশ পেয়েই নূতন নূতন আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দ্বারা নিজেদের উন্নত করবার সুযোগও তারা পেল। মাটির বাসন তারা তৈরি করতে শিখল, আর তারই সাহায্যে তাদের রান্না হত। এই সময়ের পাথরের যন্ত্রগুলি অনেক ভালো ছিল, আর বেশ সুন্দর পালিশ করাও ছিল। গরু, ছাগল,

www.nagorikpathagar.org

ভেড়া, কুকুর—এদের তারা পোষ মানিয়ে নিল। আর পরনের কাপড় বুনতেও তারা শিখেছিল।

এই যুগের মানুষ কুড়েঘরে বাস করত। এই কুড়েঘরগুলি কোনো হ্রদের মধ্যে নির্মাণ করা হত, যাতে বন্য পশু অথবা অন্যান্য মানুষ তাদের আক্রমণ করতে না পারে। কাজেই এই লোকদের বলা হয় হ্রদবাসী।

এই লোকদের বিষয় এত সব কথা আমরা কেমন করে জেনেছি ভেবে তুমি নিশ্চয়ই ভারি আশ্চর্য হচ্ছ—তাদের লেখা কোনো বই তো আর আমাদের কাছে নেই? কিন্তু আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, এসব মানুষের কাহিনী আমরা যে-বই থেকে জেনেছি, সে হচ্ছে প্রকৃতির নিজের হাতের লেখা বই। কিন্তু এই বইখানা

পড়া সহজ নয়। তার জন্য চাই অসীম ধৈর্য। এই বইখানা পড়বার চেষ্টায় বহু লোক তাঁদের সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা বহু ফসিল্ আর পুরাকালের বহু ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করেছেন। বড় বড় মিউজিয়ামে এই সব ফসিল সংগ্রহ করে

www.nagorikpathagar.org

রাখা হয়েছে। সেই সব মিউজিয়ামে এই নবপ্রস্তর-যুগের মানুষদের তৈরি, পালিশ করা কুড়ুল, নানা রকমের পাত্র, পাথরের তীর, সূঁচ, এরকম আরও সব জিনিস তুমি দেখতে পাবে। এর অনেক জিনিসই তুমি দেখেছ, এখন হয়তো ভুলে গেছ। আবার দেখলে এখন নিশ্চয়ই আরো ভালো করে বুঝবে।

আমার মনে আছে, জেনিভা মিউজিয়ামে একটা হ্রদবাড়ির সুন্দর নমুনা দেখেছিলাম। হ্রদের মধ্যে কাঠের খুঁটি পোতা, সেই খুঁটির উপর একটা মঞ্চ, আর ঐ মঞ্চের উপর কাঠের কুটির সব নির্মাণ করা হয়েছিল, এবং সমস্ত বাড়িটা একটা কাঠের পুলের দ্বারা তীর সংলগ্ন ছিল।

এই নূতন প্রস্তর-যুগের মানুষেরা পশুর চামড়া পরে থাকত, কখন কখনও বা flax এর তৈরি একরকমের মোটা কাপড়ও পরত।

একরকমের ছোট গাছ, এর আঁশ থেকে বেশ কাপড় তৈরি হয়। এই flax থেকেই লিনেনের কাপড় তৈরি হয়। সেই দিনের flax এর তৈরি কাপড় যে খুব মোটা ছিল, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

মানুষ দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে চলল। তারা তামা আর কাঁসার যন্ত্রপাতি তৈরি করতে আরম্ভ করল। কাঁসা হল তামা আর টিনের এক রকমের মিশ্র ধাতু, দুটার চেয়েই শক্ত। সোনার ব্যবহারও তারা জানত, আর সোনার গয়না পরে গর্ব করবার ভাবও তাদের মনে মনে বেশ ছিল।

যাদের কথা তোমাকে বললাম, তারা প্রায় ১০,০০০ হাজার বৎসর আগের মানুষ, একেবারে ঠিক সময়টা নিরূপণ করে বলা অবশ্য খুবই মুশকিল। বেশির ভাগ অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। এর আগে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের কথাই বলে এসেছি। এখন আমাদের নিজেদের যুগের কাছাকাছি এসে পড়েছি। প্রস্তর যুগের এই নবপর্যায় থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের মানুষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতার কোনো ছেদ নেই, হঠাৎ কোনো পরিবর্তনও নেই। কিন্তু তবু এই দুই যুগের মানুষের মধ্যে বিস্তর তফাত। পরিবর্তনটা এসেছে খুব ধীরে—প্রকৃতির নিয়মই এই। কতকগুলি বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হল, আর প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ ধারায় জীবনের পথে অগ্রসর হতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভিন্ন, কাজেই প্রত্যেক দেশের মানুষই সেই সেই দেশের আবহাওয়ার আবেষ্টনে এক একটি বিভিন্ন জাতি হয়ে গেল। এই বিষয় নিয়ে পরে আরো বলব।

আরেকটা কথা তোমাকে আজ বলব। এই নবপ্রস্তরযুগের প্রায় শেষাশেষি মানুষের এক মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছিল। তোমাকে তো এর আগেই বলেছি, সেই সময় এখনকার ভূমধ্যসাগর মোটেই সাগর ছিল না। সেখানে কয়েকটা হ্রদ ছিল, সেই হ্রদগুলির মধ্যে মানুষের বসবাস ছিল। হঠাৎ এক সময় ইউরোপ আর আফ্রিকার মধ্যের জিব্রালটার দেশটা বন্যায় ভেসে গেল আর আটলান্টিকের জল নিচের উপত্যকায়, (এখনকার ভূমধ্যসাগরে) গড়িয়ে পড়তে লাগল। অবিশ্রাম গতিতে জল গড়াতে লাগল; হ্রদের ভিতর, আর কাছাকাছি যত লোক ছিল, অনেকেই বন্যার জলে ভেসে গেল। কোথাও যে গিয়ে রক্ষা পাবে, তারও উপায় ছিল

www.nagorikpathagar.org

না—শতশত মাইলব্যাপী সমস্ত দেশটাই তো একেবারে জলে জলময়। আটলান্টিকের জল সেই নিচু ভূমিতে অনবরত গড়াতেই লাগল, তার থেকেই ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি হল।

তুমি প্রলয়বন্যার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ, হয়তো পড়েও থাকবে। বাইবেলে এর বিষয় লেখা আছে, আমাদের কোনো কোনো সংস্কৃত গ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ আছে। মধ্যভূখণ্ডের আটলান্টিকের জলে পূর্ণ হওয়াই হয়তো বা এই প্রলয়বন্যা। যে অল্প কয়জন লোক কোনো রকমে বেঁচে গেল, তারা নিশ্চয়ই এই মহাপ্রলয়ের কথা তাদের সন্তানদের কাছে বলেছিল, আর ওরাও সেই কাহিনীটা স্মরণ করে রেখেছিল, তারাই আবার তাদের সন্তানদের সেই কথা বলেছিল। এই রকমে কাহিনীটা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে।

www.nagorikpathagar.org

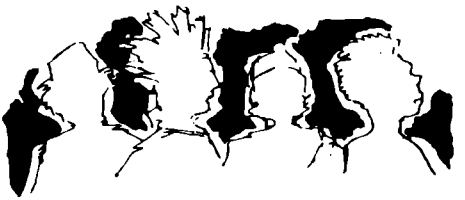

ভিন্ দেশের ভিন্ জাতি

এর আগের চিঠিতে নবপ্রস্তর-যুগের মানুষদের কথা বলেছি। এরা কিন্তু বেশির ভাগই হ্রদবাসী ছিল। এই যুগের মানুষেরা যে নানাদিকে অনেক উন্নতি করেছিল, তা দেখেছ। তারা কৃষির উদ্ভাবন করেছিল, রান্না করতে তারা জানত, আর নিজেদের সুবিধার জন্য পশু পালনও করত। এ কিন্তু বহু সহস্র বৎসর আগেকার কথা, কাজেই এ সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। পৃথিবীতে এখন যেসব বিভিন্ন জাতির মানুষ আছে তার বেশির ভাগই হয়তো এই যুগের মানুষের বংশধর। তুমি তো জানই, পৃথিবীতে আজকাল আমরা যত সব মানুষ দেখছি, তাদের কেউ শ্বেত, কেউ পীত, কেউ বাদামি, আর কেউ বা কালো। অবশ্য মানুষের বিভিন্ন জাতিগুলিকে এই চারটি মূলভাগে ভাগ করা সহজ নয়। বিভিন্ন জাতি মিশে গেছে, কাজেই অনেক জাতিরই সম্বন্ধে ঠিক করে বলা যায় না, তাদের কোন্ বিভাগে ফেলব। বৈজ্ঞানিকরা মানুষের মাথা মেপে অনেক সময় বলে দিতে পারেন, কে কোন্ জাতির এটা স্থির করবার অন্য উপায়ও আছে।

এসব বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হল কেমন করে? তারা যদি একই মানুষের বংশধর, তবে আজকের দিনে তাদের মধ্যে এত বিভিন্নতা এসেছে কেন? তুমি তো জান, একজন জার্মান ও একজন নিগ্রোর মধ্যে আকৃতির কত তফাত। একজনের গায়ের রং শাদা, আরেক জনের কালো। জার্মানের চুল লম্বা, ফিকে রং-এর; নিগ্রোর চুল খাটো, কোঁকড়ান, আর কালো রং-এর। একজন চীনাম্যান কিন্তু এদের উভয়ের চেয়েই একেবারে ভিন্ন। এই বৈষম্য যে মানুষের মধ্যে কেমন করে ঢুকল বলা মুস্কিল, তবে কয়েকটা কারণ অবশ্য আমরা জানি। নিজেদের পারিপার্শ্বিকের উপযোগী করবার জন্য কেমন করে যে ক্রমে ক্রমে প্রাণীর আকারের পরিবর্তন ঘটে, সে কথা তোমাকে বলেছি। হয়তো একজন জার্মান ও একজন নিগ্রো বিভিন্ন শ্রেণীর বংশধর, কিন্তু খুব সম্ভব একদিন তাদের উভয়েরই পূর্বপুরুষ ছিল একই মানুষ। প্রাকৃতিক ক্রমবিবর্তনের ফলেই হয়তো মানুষের মধ্যে আকারের বৈষম্য ঘটেছে; অথবা এও বলতে পার, বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া অনুযায়ী সেই সেই দেশের মানুষের শরীর গঠিত হয়েছে অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জন্মভূমির আবহাওয়া সহজে সহ্য হয়।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি—যে ব্যক্তি পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে তুষারপ্রদেশে ভীষণ হিমে বাস করে, ঠাণ্ডা সহ্য করবার শক্তি সে অর্জন করবেই। এসকিমো জাতির কথা

www.nagorikpathagar.org

ধর,—এদের বাস পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে যেখানে বৎসরের বারো মাসই দেশটা থাকে বরফে ঢাকা। এরা শীত খুব সহ্য করতে পারবে, গরম মোটেই সহ্য করতে পারবে না। আমাদের মতো গরম দেশে ওদের নিয়ে আসলে ওরা হয়তো মরেই যাবে। তারা পৃথিবীর অন্য সব দেশের চেয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, আর তাদের জীবন-যাপনও করতে হয় বড় কষ্টে; কাজেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদের মতো বহু বিষয়ে তারা আজও জ্ঞান লাভ করতে পারে নাই। আফ্রিকা আর বিষুব রেখার কাছাকাছি দেশগুলি তো ভীষণ গরম, কাজেই সে সব দেশের লোকদের গরমটা খুব সহ্য হয়। সূর্যের প্রখর কিরণে তাদের গায়ের রং হয়ে গেছে একেবারে কালো। সমুদ্রের পারে অথবা অন্য কোথাও যদি তুমি অনেকক্ষণ ধরে বাইরে বাইরে রোদে কাটাও, দেখবে, তোমার গায়ের রংটা হয়ে যাবে অনেকটা তামাটে, আর তোমার গায়ের রং আসলে যা, তার চেয়ে অনেক মলিন হয়ে যাবে। কয়েক সপ্তাহের 'সূর্য-স্নানের' ফলেই যদি তোমার গায়ের রং মলিন হয়ে যায়, তবে ভেবে দেখ তো, যাকে সব সময় বাইরে কাটাতে হয়, তার কী অবস্থা হবে? আবার শত শত বৎসর ধরে পুরুষানুক্রমে যদি কোনো জাতি গরম দেশে বসবাস করতে থাকে, তবে তারা আস্তে আস্তে কালো হতে হতে একেবারেই কালো হয়ে যাবে। আমাদের ভারতবর্ষের কৃষকদের দেখেছ, তারা দুপুরের রোদে মাঠে কাজ করে; এত দরিদ্র যে,যথেষ্ট কাপড়-চোপড় পরবার মতো অর্থ তাদের নেই, কাজেই তাদের পরনে খুব কম কাপড়। সারাটা শরীরে তাদের রোদ লাগে, আর জীবনের সবগুলি দিন তারা এমনি কাটিয়ে দেয়। কাজেই, তাদের গায়ের রং যে কালো হবে তা তো বুঝতেই পার।

এখন হয়তো বুঝেছ, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুযায়ী মানুষের গায়ের রং বদলায়। তার যোগ্যতা, তার ভালো হওয়া অথবা তার অঙ্গসৌষ্ঠব, তার গায়ের রঙের উপর মোটেই নির্ভর করে না। একজন গৌরবর্ণ লোক যদি বহু কাল ধরে গরমের দেশে রোদের আড়াল হয়ে না থাকে, তবে তার গায়ের রং কালো হয়ে যাবেই। তুমি তো জান আমরা কাশ্মিরী, দুশ বছরেরও আগে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বাড়ি ছিল কাশ্মিরে। কাশ্মিরে দেখেছ সবাই, এমন কী কৃষক মজুরেরাও-ও, দেখতে খুব ফরসা। এর কারণ, কাশ্মির ঠাণ্ডার দেশ। আবার এই গৌরবর্ণ কাশ্মিরিরাই ভারতবর্ষের অন্য কোনো গরম প্রদেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করলে কালো হয়ে যাবে। আমাদের কাশ্মিরি বন্ধুদের মধ্যেই কেহ কেহ বেশ ফরসা, আবার কেহ কেহ খুব কালো। যে কাশ্মিরি পরিবার যত বেশি দিন গরমের দেশে বসবাস করবে, তাদেরই তত বেশি কালো হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

কাজেই দেখ মানুষের গায়ের রঙের বিভিন্নতার প্রধান কারণ, প্রাকৃতিক আবহাওয়া। অবশ্য এমন লোকও আছে যারা গরম দেশে বাস করলেও কখনও বাহিরে বের হয়ে কাজকর্ম করে না, বড় বড় বাড়িতে বাস করে, আর নিজের শরীর আর গায়ের রঙের তদ্বির করবার জন্য প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে। কোনো ধনি পরিবার যদি পুরুষানুক্রমে এরকম ভাবে জীবন কাটায়, তবে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

প্রভাব এড়িয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু নিজের হাতে কাজকর্ম না করে পর-নির্ভর হওয়ার মধ্যে যে গর্ব করবার কিছু নেই, তা তো বুঝতেই পার।

কাশ্মির, পাঞ্জাব আর ভারতবর্ষের উত্তরাংশের লোকেরা যে সাধারণত ফরসা হয়, তা দেখেছ। কিন্তু দক্ষিণদিকে যত যাবে, দেখবে সেই সব দেশের লোকের গায়ের রং তত কালো। মাদ্রাজ আর সিংহলের লোকেরা তো খুবই কালো। এ যে কেবল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দরুণই এরকম হয়েছে, এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বলবে, কারণ যতই দক্ষিণে বিষুবরেখার কাছাকাছি যাওয়া যায় আবহাওয়াও ততই গরম বোধ হয়। কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের লোকদের গায়ের রঙের বিভিন্নতার এই-ই প্রধান কারণ। এর পরে তোমাকে আর একটা বিষয় বলব,— প্রাচীন কালে যেসব বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল তারা প্রথমে বিভিন্ন ছিল; এও একটা কারণ। প্রাচীন কালে বহু বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে এসেছিল, আর বহু দিন পরস্পর না মিশে থাকবার চেষ্টাও তারা করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। আজকাল জোর করে কারুর সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, সে একটা মূল জাতির বংশধর, তার রক্তে একাধিক জাতির রক্ত নেই।

www.nagorikpathagar.org

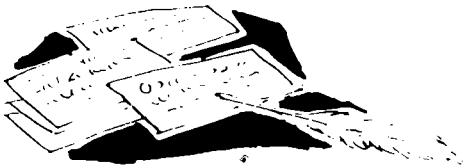

বিভিন্ন জাতি ও তাদের ভাষা

পৃথিবীর কোনো অংশে যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল তা বলা মুশকিল, কোন্ দেশটা যে মানুষের আদি বাসভূমি তাও বলা যায় না। হয়তো পৃথিবীর নানা অংশে প্রায় একই সময়ে মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। খুব সম্ভব তুষারযুগের তুষার-নদীগুলি গলে গলে যখন উত্তর দিকে সরে যাচ্ছিল, মানুষ তখন অপেক্ষাকৃত গরম দেশে বাস করত। তারপর বরফের নদীগুলি সরে যাবার পর পেছনে রয়ে গেল, গাছপালাহীন কতকগুলি সমতল প্রান্তর, কতকটা সাইবেরিয়ার তুন্দ্রাভূমির মতো। ঐ সব প্রান্তরগুলি আস্তে আস্তে ঘাসে ভরে গেল, মানুষেরাও তাদের গৃহপালিত পশুদের ঘাসের জন্য এসব স্থানের আশেপাশে ঘুড়ে বেড়াত। এরকম সব মানুষ যাদের থাকবার কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই, আর সব সময় কেবল ঘুরে বেড়ায়, তাদের বলা হয় 'যাযাবর'। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবরি আরো নানা জায়গায় এরকম 'যাযাবর' জাতি এখনও দেখা যায়, এদের ইংরেজিতে বলা হয় Gypsy.

মানুষেরা বড় বড় নদীর তীরেই বসবাস শুরু করেছিল, কারণ নদীর উপকূলের জমিই খুব উর্বর, কাজেই কৃষির পক্ষে খুব উপযোগী। জলের প্রাচুর্য হেতু ঐ রকম সব স্থানেই শস্য জন্মানো সহজ ছিল। কাজেই আমাদের মনে হয়, ভারতবর্ষে গঙ্গা আর সিন্ধুর উপকূলে, মেসোপোটামিয়ায় টাইগ্রিসের উপকূলে, মিশরে নীলনদের উপকূলে, আর চীন দেশেও কতকগুলি বড় বড় নদীর তীরে মানুষেরা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল।

ভারতবর্ষে দ্রাবিড় জাতি হল প্রাচীনতম জাতি যাদের কথা আমরা উল্লেখযোগ্যভাবে কিছু জানি। আর্য এবং মোঙ্গলেরা ভারতবর্ষে এসেছিল এই দ্রাবিড়দের পরে—উত্তর দিক দিয়ে ঢুকেছিল আর্যরা আর পূর্বদিক দিয়ে মোঙ্গলেরা। আজকালও, দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই কিন্তু দ্রাবিড়দের বংশধর। দ্রাবিড়গণ ভারতবর্ষে বেশি দিন আছে বলেই হয়তো উত্তর ভারতের লোকদের চেয়ে তাদের গায়ের রং বেশি কালো। এই দ্রাবিড় জাতি খুব সভ্য ছিল। তাদের নিজেদের ভাষা ছিল, আর অন্য দেশের লোকদের সাথে এরা ব্যবসাবাণিজ্য ও করত। যাক, এসব পরের কথা।

সেই আদিম যুগে, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় এবং পূর্ব ইউরোপে একটি নূতন জাতির পরিণতি আরম্ভ হয়েছিল। এদের বলা হয় আর্য জাতি। সংস্কৃত ভাষায় এই আর্য শব্দটির অর্থ ভদ্র অথবা উচ্চ বংশোদ্ভব। আবার এই সংস্কৃত ভাষা কিন্তু আর্য-

www.nagorikpathagar.org

ভাষাগুলিরই অন্যতম, কাজেই মনে হয়, আর্যগণ নিজেদের মনে করত খুব ভদ্রলোক আর উঁচু বংশের।

এরা খুব গর্বিত জাতি ছিল—আজকালকার মানুষের মতোই আর কী! জানোই তো, ইংরেজরা মনে করে পৃথিবীতে তারাই প্রধান জাতি, ফরাসিদেরও নিশ্চিত ধারণা তারাই শ্রেষ্ঠ, আর জার্মান, আমেরিকান এবং অন্যান্য সব জাতি, তারাই কেন বাদ যায়, তাদের ধারণাও ঠিক ঐ।

এই আর্যগণ উত্তর এশিয়ার এবং ইউরোপের বিস্তৃত তৃণভূমির চারদিকে ঘুরে বেড়াত। জনসংখ্যা তাদের ক্রমেই বৃদ্ধি হতে লাগল, আবহাওয়াটাও আস্তে আস্তে শুকনো হতে লাগল, ঘাস কমে গেল, আর সকলের উপযোগী খাদ্যেরও অভাব পড়ে গেল। কাজেই খাদ্যের খোঁজে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় তাদের বাধ্য হয়ে সরে যেতে হল। তারা ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল, আবার এদিকে কতক কতক ভারতবর্ষ, পারস্য ও মেসোপোটামিয়াতেও চলে আসল। কাজেই দেখ, ইউরোপ, উত্তর ভারত, পারস্য ও মেসোপোটামিয়ার প্রায় সব জাতি, দেখতে আজ এতো ভিন্ন হলেও আসলে এক আর্য জাতিরই বংশধর। এ অবশ্য বহু দিন আগেকার কথা; সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনাই ঘটেছে, আর সব জাতিই বহুল পরিমাণে একত্রে মিশে গেছে। এই আর্যগণ পৃথিবীর বহু জাতির পূর্বপুরুষ।

মোঙ্গলেরা আর একটা বড় জাতি। এরা পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের অনেকে বলে পীত জাতি। এদের দেখবে, চোয়ালের হাড় সাধারণত উঁচু, আর চোখ দুটো ছোট।

আফ্রিকা এবং আরো কোনো কোনো দেশে কাফ্রিদের বাস। এরা না আর্য, না মোঙ্গল, গায়ের রং এদের ঘোর কৃষ্ণ। আরব দেশের আরব জাতি ও পেলেস্টাইনের হিব্রু জাতি আবার আরএকটা ভিন্ন জাতি।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দেশান্তরে যাওয়ার পথ

www.nagorikpathagar.org

এই সবগুলি জাতিই হাজার হাজার বৎসরের পরিবর্তনের ফলে বহু শাখা-জাতিতে ভাগ হয়ে গেছে এবং কতকটা মিশ্রিতও হয়ে গেছে। যাক এ নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। এ-সব জাতির পাঁতি ঠিক করবার একটা প্রধান আর মজার উপায় হচ্ছে, তাদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা। প্রত্যেক জাতিরই প্রথম অবস্থায় এক একটি নিজস্ব আলাদা ভাষা ছিল, আস্তে আস্তে আবার সেই মূল ভাষাগুলি থেকেই অনেকগুলি করে উপভাষার সৃষ্টি হল। এই উপভাষাগুলি কিন্তু এক একটি মূল ভাষারই পরিণতি এবং বলা যায় একপরিবার ভুক্ত। এই সব বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ শব্দ পাওয়া যায়, এবং তা থেকেই বিভিন্ন ভাষার সম্বন্ধটাও নির্ণয় করা যায়।

আর্যগণ যখন সমস্তটা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তাদের পরস্পরের সম্বন্ধও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল—সে দিনে তো তার রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর অথবা লেখা কোনো বই ছিল না, —তাই।

আর্যদের বিভিন্ন দলগুলি, কিন্তু মূলভাষাটাকেই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করল, কাজেই কিছুকাল পরে, আর্যদের বিভিন্ন দেশের জ্ঞাতিভাষাগুলির মধ্যেও পরস্পর আর কোনো সাদৃশ্য রইল না। এই কারণেই পৃথিবীতে আজ এতগুলি বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিভিন্ন ভাষাগুলি আলোচনা করে কিন্তু আমরা দেখেছি এদের সংখ্যা বেশি হলেও, মূল ভাষা মাত্র অল্প কয়েকটি। কারণ, বুঝতেই পার, আর্যগণ যে যে দেশে গিয়েছিলেন, সেই সেই দেশের ভাষাগুলিও মূল আর্য ভাষারই অন্তর্গত। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিক, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় এবং আরো কতকগুলি ভাষা সব জ্ঞাতি-ভাই—মূল আর্য ভাষার সন্ততি। আমাদের ভারতবর্ষের অনেক ভাষা, যেমন, হিন্দি, বাংলা মারাঠি, গুজরাটি, এগুলিও সব সংস্কৃতমূলীয়, কাজেই এদের গোত্রও আর্য। চৈনিক ভাষারও একটা মস্ত পরিবার আছে। চীনা, বর্মি, তিব্বতি আর শ্যাম ভাষা এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় আর একটা পরিবার হল সেমিটিক, আরবি আর হিব্রু এর অন্তর্গত। আবার কয়েকটা ভাষা, যেমন তুর্কি, জাপানি এদের কিন্তু আগের ঐ তিনটি ভাষার কোনোটির সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক নেই।

দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি ভাষা যেমন তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম এবং কানারি এরাও ঐ সব পরিবারের সাথে সম্পর্কবিহীন। এই চারটিই খুব প্রাচীন **দ্রাবিড় পরিবারের**।

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন ভাষার সম্পর্ক

আর্যগণ যে পৃথিবীর নানা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তা বলেছি। তাদের তখনকার ভাষাটা যে কী রকম ছিল, তা অবশ্য আমাদের জানা নেই; তবে বুঝতেই পারছ, তাদের ঐ ভাষাটাও তারা সঙ্গে করে নানা দেশে নিয়ে গেল। বিভিন্ন আবহাওয়া আর বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থার আবেষ্টনে তারপর আর্যদের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে নানা রকমের পরিবর্তন এসে গেল। কোনো দলের সাথে কোনো দলেরই আর সম্পর্ক রইল না, কাজেই প্রত্যেক দলই যার যার ভাবে, আচার-ব্যবহারে, পরিবর্তিত হতে লাগল। তখন ভ্রমণ বড় কষ্টের ছিল, তাই একবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে এক দলের সঙ্গে অন্য দলের আর কখনো দেখা সাক্ষাৎই হত না। কোনো দেশের লোক নূতন একটা কিছু আবিষ্কার করলে, সে কথা অন্য দেশের লোকদের জানাতেও পারত না। এমনি ভাবেই পরিবর্তন শুরু হল, এবং কয়েক পুরুষ পরে একটা পরিবার বহু অংশে ভাগ হয়ে যেতে লাগল। সম্ভবত তারা ভুলেও গেল যে, তারা সবাই একটা মস্ত পরিবারের বংশধর। আবার এক একটা ভাষা থেকেও অনেকগুলি করে নূতন ভাষার সৃষ্টি হতে লাগল, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল রইল না।

দেখতে ভাষাগুলি এতো ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে কতকগুলি একই রকমের শব্দ, আর কতকটা সাদৃশ্যও অবশ্য রয়ে গেল। বহু সহস্র বৎসর পরে, ঐ একরকমের শব্দগুলি আজ পর্যন্তও বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। এই থেকেই মনে হয়, এই বিভিন্ন ভাষাগুলির গোড়াতে, একটা ভাষাই রয়েছে। তুমি তো জান ফরাসি আর ইংরেজি ভাষায় একরকমের অনেকগুলি সাধারণ শব্দ আছে। খুব নিত্য ব্যবহৃত দুটা ইংরেজি শব্দ ধর— father, mother: হিন্দি ও সংস্কৃতে এর সমানার্থক শব্দ দুটি হল 'পিতা' 'মাতা'; ল্যাটিনে, 'Pater' 'Mater'; গ্রিক ভাষায়, 'Pater meter' জার্মান ভাষায়, 'Vater' (উচ্চারণ, ফাতর) 'mutter' (উচ্চারণ, মুতর); ফরাসি ভাষায়, 'pere' 'mere'. অন্যান্য অনেক ভাষায়ও ঠিক এমনিধারা শব্দই রয়েছে। এদের তো মনে হয় যেন একই রকমের শব্দ,—কেমন না? সবগুলিই যেন এক পরিবারের জ্ঞাতিভাই। অনেক শব্দই অবশ্য এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় ধার করা হয়েছে। ইংরেজি থেকে অনেক শব্দ হিন্দি ভাষায় এসেছে, আবার তেমনি হিন্দি থেকেও অনেক শব্দ ইংরেজি ভাষায় গিয়েছে। কিন্তু 'পিতা' 'মাতা' বুঝাবার জন্য, দুটি শব্দ অবশ্য কেহই কারুর কাছ থেকে ধার করে নাই, আর শব্দ দুটাও নূতন

www.nagorikpathagar.org

নয়। মানুষ প্রথম যেসময় থেকে কথা বলতে শিখেছিল, পিতামাতাকে বুঝাবার জন্য দুটা শব্দও সেসময় থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে এ দুটা ধার-করা শব্দ নয়। এই শব্দ দুটা একই পরিবার, আর একই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে এসেছে। এর থেকেই মনে হয়, বহু জাতি, যারা আজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে বহু দূরে দূরে বাস করছে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলছে, একদা তাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই ছিল এক পরিবারের। দেখলে তো, এসব বিভিন্ন ভাষার কথা আলোচনা করে কেমন আনন্দ পাওয়া যায়, কত কিছু শিক্ষা করা যায়। তিন চারটা ভাষা যদি তুমি শিখে নিতে পার, আরো কয়েকটাও খুব সহজেই শিখে নিতে পারবে।

তবেই দেখ, পৃথিবীর বহু জাতি, যারা আজ বহু দূরে দূরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করছে, তারাই বহু পূর্বে একটা জাতি ছিল। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক পরিবর্তনই মানুষের হয়েছে, আর সাথে সাথে আমাদের পুরানো আত্মীয়তাটাও আমরা অনেকেই ভুলে গেছি। সব দেশের মানুষই আপনাদের দুনিয়ার সেরা, আর সব চাইতে চতুর জাতি মনে করে, সকলেরই ধারণা আর কারোর সঙ্গেই তাদের তুলনা চলে না। ইংরেজ মনে করে সে আর তার দেশ সবার সেরা; ফরাসির তো ফ্রান্স, আর ফ্রান্সের যত কিছু সব নিয়েই গর্ব; জার্মান, ইটালিয়ানরাও যার যার নিজের দেশের কথা ভাবতে অজ্ঞান; আবার অনেক ভারতবাসী মনে করে, ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে অনেক বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। এ কিন্তু আত্মাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকেই তার জাতি আর দেশকে শ্রেষ্ঠ বলতে চায়। দুনিয়ার সব মানুষই যেমন ভালোমন্দে মিশানো, পৃথিবীর সব দেশও তেমনি। কোনো দেশই নিছক ভালো-ও নয়, নিছক মন্দও নয়। ভালোর সন্ধান যেখানেই পাবে, সেখান থেকেই তাকে গ্রহণ করবে; মন্দ যেখানেই দেখবে নিঃসঙ্কোচে তাকেও পরিহার করবে। আমাদের স্বদেশ ভারতবর্ষই অবশ্য আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় হবে। আমাদের দেশের আজ বড় দুরবস্থা; আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক বড় দরিদ্র, বড় দুঃস্থ। জীবনে তাদের এক ফোঁটাও আনন্দ নেই। দরিদ্র ও দুঃস্থ যারা, তাদের কেমন করে সুখী করা যায়, তাই আমাদের দেখতে হবে। আমাদের রীতিনীতির যেটুকু ভালো সেটুকু তো আমরা রাখবই, আর যা কিছু খারাপ তাকেও পরিত্যাগ করব। অন্য দেশের যেটুকু ভালো সেটুকুও অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব।

ভারতবাসী হিসাবে ভারতবর্ষেই আমাদের বাস করতে হবে, আর এই দেশের সেবার জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে। কিন্তু এ ভুলে গেলেও আমাদের চলবে না, আমরা সবাই পৃথিবীর একটা মস্ত পরিবারের মানুষ, অন্য সব দেশের মানুষও আমাদেরই ভাই। পৃথিবীর সব মানুষই যদি সুখে শান্তিতে থাকতে পারত, পৃথিবীটা তবে কী আনন্দেরই না হত। পৃথিবী যাতে সুখনিকেতন হয়, সেই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

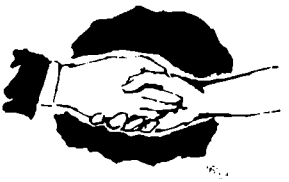

সভ্যতা কী?

এবার প্রাচীন সভ্যতার কথা কিছু বলব। কিন্তু সভ্যতা অর্থে কী বুঝায় তাই আগে দেখা যাক। অভিধান খুঁজে দেখবে,—সভ্য হওয়া মানে উন্নত হওয়া, মার্জিত হওয়া, অভদ্র রীতিনীতির পরিবর্তে ভদ্র আচার গ্রহণ করা। আর এই 'সভ্যতা' শব্দটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয় কোনো সমাজ অথবা কতকগুলি দলবদ্ধ লোক সম্বন্ধে। যে অসভ্য অবস্থায় মানুষ প্রায় পশুর মতো জীবনযাপন করে, তাকে বলা হয় বর্বরতা। এর ঠিক উল্‌টো অবস্থাটাই সভ্যতা। বর্বর অবস্থা থেকে যত উন্নত হওয়া যায়, ততই আমরা সভ্যতার পথে এগিয়ে যাই।

কিন্তু আসল কথা, কেমন করে বুঝব কোনো একজন মানুষ অথবা কোনো একটা সমাজ বর্বর কী সভ্য? ইউরোপের অনেক লোকই তো মনে করে তারা নিজেরা খুব সভ্য, আর এশিয়ার যত লোক সব অসভ্য, বর্বর। হয়তো, এশিয়া ও আফ্রিকার লোকদের চেয়ে ইউরোপের লোকেরা বেশি কাপড়চোপড় ব্যবহার করে বলে তাদের এই ধারণা। কিন্তু কাপড় চোপড় পরবার রকমটাতো নির্ভর করে দেশ আর আবহাওয়ার উপর—ঠাণ্ডা দেশের লোকেরা গরম দেশের লোকদের চেয়ে বেশি কাপড় পরে। আর কে জানে, এ-ও হতে পারে, যাদের হাতে বন্দুক আছে তারা, যারা অস্ত্রহীন তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলেই, নিজেদের বেশি সভ্য মনে করে। যে শক্তিশালী, তাকে সভ্য বলে স্বীকার না করা দুর্বলের পক্ষে যথেষ্ট ভয়ের কারণ,—বন্দুকধারীর কাছে প্রাণের মায়াটাতো করতে হয়!

তুমি শুনেছ, অল্প কয়েক বৎসর আগেই ইউরোপে একটা ভীষণ যুদ্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক জাতিই এ যুদ্ধে নেমেছিল, আর প্রত্যেকেরই চেষ্টা ছিল, অপর পক্ষের লোককে কত হত্যা করতে পারে। ইংরেজ যথাসাধ্য জার্মানদের হত্যা করবার সুযোগে ছিল, আর জার্মানরাও ইংরেজদের হত্যা করতে কসুর করে নাই। লক্ষ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হত হয়েছে, বহু সহস্র লোক চির-জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে রয়েছে। কারো কারোর চোখ দুটি নষ্ট হয়ে গেছে, কারো হাত নেই, কারো বা পা নেই। ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশে 'যুদ্ধে বিকলাঙ্গ' (mutiles de la guerre) এরূপ অনেক লোকই তুমি দেখেছ। প্যারি শহরের মাটির নিচের রেলওয়েতে এসব লোকদের বসবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত রয়েছে। তুমি কী মনে কর, এরকমভাবে পরস্পরকে হত্যা করার মধ্যে কোনো সভ্যতা অথবা বুদ্ধির প্রকাশ পেয়েছিল? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনে ঝগড়া করলে পুলিশ এসে তাদের ছাড়িয়ে দেয়; লোকেও

www.nagorikpathagar.org

তাদের মূর্খ মনে করে। কিন্তু ভেবে দেখ তো, দুটা গোটা দেশ আর জাতির পক্ষে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করা, আর সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণবধ করা, আরো কত বড় বোকামি, আর মূর্খতা। এ যেন জঙ্গলের ভিতর দুটো বুনো লোকের লড়াই। বন্য লোকদের বলা হয় বর্বর, কিন্তু যে সব জাতি ঠিক এমনিভাবে বিরোধ করে, তাদের এর বেশি আর কী বলা যায়?

কাজেই প্রশ্নটা যদি এদিক থেকে বিচার করে দেখ, তবে বুঝবে, গত যুদ্ধে, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি এবং অন্যান্য দেশের সব জাতি খুন আর লড়াই করেছে, তাদের কেহই সভ্য নয়। কিন্তু আবার একথাও খুবই সত্য, এসব দেশেই কত সুন্দর জিনিস আছে, আর কত সব মহৎ লোকও রয়েছেন।

তুমি হয়তো এখন বলবে, সভ্যতার অর্থ বোঝা কঠিন। তা সত্যি, এ একটা কঠিন প্রশ্নই বটে। সুন্দর সুন্দর দালান, সুন্দর সুন্দর ছবি, ভালোভালো বই এবং যা কিছু সুন্দর সুচারু, সবই সভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু এর চেয়েও ভালো লক্ষণ হচ্ছে স্বার্থলেশ শূন্য মহৎ মানুষ, যিনি সকল লোকের হিতার্থে সবার সঙ্গে এক যোগে কাজ করেন। একাএকা কাজ করার চেয়ে এক সঙ্গে কাজ করা ভালো, আর সকলের হিতের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করা সবচেয়ে ভালো।

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতার প্রথম ধাপ—মানুষের দল গঠন

আমার আগের চিঠিগুলিতে তোমাকে এই কথা বলেছি যে, মানুষের যখন পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভাব হয়, তার জীবনযাত্রার রীতি ছিল অনেকটা পশুর মতো। আস্তে আস্তে বহু সহস্র বৎসরের পরিণতির ফলে সে একটু একটু করে উন্নত হতে লাগল। এখনকার অনেক বন্য পশুর মতো প্রথম অবস্থায় সে-ও একাই শিকার করতে বের হতো। ধীরে ধীরে অবশ্য সে বুঝল, কয়েকজন মিলে এক সঙ্গে শিকার করতে যাওয়াই অনেক নিরাপদ। দলবদ্ধ অবস্থায় তাদের শক্তিও বেড়ে যাবে, কাজেই অন্যান্য পশু অথবা মানুষ—শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও অনেক সহজ হবে। নিজেদের বিপদ এড়াবার জন্য অনেক পশুও দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। ভেড়া, ছাগল, হরিণ, এমন কী হাতিও দল বেঁধে বাহির হয়। যখন দলের আর সবগুলি ঘুমায় তখন কয়েকটা জেগে জেগে পাহারা দেয়। দলবদ্ধ নেকড়ে বাঘের অনেক গল্প তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ। রুশ দেশে শীতকালে নেকড়ে বাঘগুলির যখন ক্ষুধা পায়—শীতকালেই নাকি এদের ক্ষুধটা বেড়ে যায়—এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়, আর মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে। একা থাকলে কিন্তু মানুষকে কখনও বড় একটা আক্রমণ করে না, তবে দলবদ্ধ অবস্থায় একদল মানুষকে আক্রমণ করতেও এরা ভয় পায় না, তখন মানুষদের প্রাণভয়ে পালাতে হয়। অনেক সময় শ্লেজগাড়ির মধ্যে মানুষ, আর পেছনে নেকড়ে, এদের মধ্যে রীতিমতো দৌড়ের পাল্লা লেগে যায়।

দলবদ্ধ হওয়ার শিক্ষাই মানুষের সভ্যতার প্রথম ধাপ। আর এই একএকটা দলকেই বলা যায় জাতি। দলের লোকেরা সবাই মিলে এক সঙ্গে কাজকর্ম করত। এই হল সমবায় প্রথার সূত্রপাত। দলের প্রত্যেক লোকেরই প্রথম চিন্তা করতে হত তার দলের কথা, তারপর নিজের কথা। দলের কোনো বিপদ উপস্থিত হলে দলের সবাইকে যুদ্ধ করে দলটাকে রক্ষা করতে হত। যদি কাউকে দেখা যেত যে দলের কাজে সাহায্য করে না, তবে তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হত।

কিন্তু মানুষকে এক সঙ্গে কাজ করতে হলে তার বিধিবিধান চাই। সবাই যদি যার যার নিজ নিজ মতে চলে, তবে তো দলটা শিঘ্রই ভেঙে যাবে, কাজেই একজন নেতা অথবা দলপতি চাই। দলবদ্ধ পশুর মধ্যেও একটা 'পালের গোদা' থাকে। দলের মধ্যে যে সবচেয়ে বলবান, তাকেই সবাই দলপতি মেনে নিত। তখনকার দিনে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করবার প্রয়োজন ছিল খুব বেশি, কাজেই সবচেয়ে যে বলবান তাকেই দলপতি করা হত।

www.nagorikpathagar.org

দলের লোকদের নিজেদেরই মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলে দলটারই লোপ পেয়ে যাবার কথা, কাজেই দলপতিকে দেখতে হত নিজেদেরই মধ্যে যাতে লড়াই না বাঁধে। অবশ্য, একটা দল আর একটা দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। সর্বপ্রথমে, মানুষ একাকি সবাই সবাইর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, আরো পরে যখন সে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে শিখল, সেটাকে নিশ্চয়ই বলতে হবে তার এক ধাপ উন্নতি।

প্রথম অবস্থায়, এক একটা দল ছিল একএকটা মস্ত পরিবার, দলের প্রত্যেকের মধ্যেই পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। পরিবারের লোকসংখ্যা যতই বাড়তে লাগল, দলও ততই বড় হতে লাগল।

সেই আদিম যুগে, বিশেষত এরকম দল সৃষ্ট হওয়ার আগে, মানুষের জীবন-যাত্রা ছিল বড় কষ্টের। তার ঘরদোর ছিল না, পশুর চামড়া ছাড়া পরণের কাপড় ছিল না, আর যুদ্ধ ছিল তার নিত্যকার ব্যাপার। প্রত্যহ আহারের জন্য হয় তাকে পশু শিকার করতে হত, নয় তো ফল, বাদাম এসব সংগ্রহ করতে হত। সে মনে করত, চারদিকেই তার শত্রু। ঝড়বাদল, শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, এসব দেখে প্রকৃতিকেও তার শত্রু বলে মনে হত। ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র প্রাণী, সবাইর পদানত হয়ে সে পৃথিবীর বুকে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াত, সব কিছু দেখেই সে ভয় পেত, কারণ, সবই ছিল তার বুদ্ধির অগম্য। ঝড় এলে তার মনে হত, মেঘের আড়াল থেকে কোনো দেবতা তাকে

www.nagorikpathagar.org

আঘাত করছে। মেঘের আড়াল থেকে যে দেবতা তাকে ঝড়, বৃষ্টি আর শিলার আঘাত করছে, ভয় পেয়ে সে চাইত সেই দেবতাকে খুশি করতে। কিন্তু কেমন করে তাকে খুশি করা যায়? বুদ্ধি তো তার সেদিন খুব প্রখর ছিল না, তাই সে ভাবত, মেঘের দেবতা বুঝি বা তারই মতো কেউ,—খুব ভোজনপ্রিয়। করত কী সে, কতকটা মাংস অথবা একটা শিকার-করা পশু, দেবতার নামে উৎসর্গ করে তার খাবার জন্য একটা জায়গায় রেখে দিত। সে মনে করত, এমনি করেই বুঝি ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

এসব আমাদের কাছে আজ মনে হয় বোকামি, কারণ, কেন যে ঝড়বৃষ্টি আর শিলাপাত হয়, তার কারণ আজ আমরা জানি। একটা পশু বধ করে আর এ-সব বন্ধ করা যায় না। কিন্তু এরকম বোকামি করবার মতো অজ্ঞ লোকের অভাব অবশ্য আজ পর্যন্ত হয় নাই।

www.nagorikpathagar.org

ধর্মের সূচনা ও কর্ম-বিভাগ

তোমাকে এর আগের চিঠিতে বলেছি, আদিম যুগের মানুষেরা কেমন সব জিনিসকেই ভয় করত, আর মনে করত, যত কিছু দুর্ঘটনার হেতু হল দেবতাদের রাগ ও হিংসা। তারা মনে করত, তাদের সেই মনগড়া দেবতারা বাস করে পাহাড়, জঙ্গল, নদী আর মেঘের ভিতর, অথবা এমনি সব জায়গায়। তাদের দেবতাকে তারা দয়ালু ভালো মানুষটি মনে করত না, ভাবত দেবতার মেজাজটা বড় রুক্ষ, সব সময় বুঝি বা তার মাথায় রাগ চড়েই আছে। দেবতার রাগ ছিল তাদের ভয়ের প্রধান কারণ, কাজেই তারা চাইত, কিছু খাবার ঘুষ দিয়ে দেবতাকে খুশি রাখতে। যখন ভূমিকম্প, বন্যা অথবা মড়ক, এমনি কোনো বিপদ উপস্থিত হত, তারা ভয়ানক ভয় পেয়ে ভাবত, দেবতাদের বুঝি বা রাগ হল, তাই দেবতাদের খুশি করতে তারা অনেক সময় মেয়েপুরুষ, এমনকি নিজেদের সন্তানদেরও, দেবতার নামে বলি দিয়ে বসত। আজ অবশ্য তুমি ভাবছ, একি বীভৎস কাণ্ড! কিন্তু ভয় পেয়ে মানুষ কী-ই বা না করে!

www.nagorikpathagar.org

এই হল ধর্মের সূচনা। ধর্মের চিন্তা মানুষের মনে প্রথম এসেছিল ভয়ের রূপে। কিন্তু ভয় পেয়ে যা কিছু করা যায়, তার মধ্যেই মন্দের বীজ লুকানো থাকে। ধর্মের মধ্যে তো জান, আমরা কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ পাই। তুমি যখন বড় হয়ে পৃথিবীর নানা ধর্মমতের কথা পড়বে, তখন দেখবে, মানুষ এই এক ধর্মের নামে কত-না মহৎ কর্ম, আর কত-না কুকর্মের অনুষ্ঠান করেছে। ধর্মের সূচনা কেমন করে হল, তাই এখানে দেখলে। পরে অবশ্য দেখবে, আস্তে আস্তে কেমন করে এই ধর্মের পরিণতি হল। মানুষের ধর্মমতের কোনো উন্নতি না হউক, আজও কিন্তু মানুষ এই ধর্মের নামে পরস্পর বিরোধ করে, একে অন্যের মাথা ভেঙে ফেলে: আর কেহ কেহ তো এখন পর্যন্ত একে ভয়ই করে।

আদিম মানুষের জীবন ছিল বড় কষ্টের। নিত্য তাকে খুঁজে খুঁজে আহার সংগ্রহ করতে হত, নইলে কপালে ছিল তার উপোস। অলস লোকের সেদিনে বেঁচে থাকা ছিল অসম্ভব; আর এ-ও সম্ভব ছিল না যে কেহ বহুদিনের খাদ্য এক দিনে সংগ্রহ করে তারপর অনেকদিন পর্যন্ত নিষ্কর্মা হয়ে কাটিয়ে দেবে।

কিন্তু, দলগঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে এল। একাকি একজনের পক্ষে যেটুকু মাত্র আহার সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, দলের সবাই

www.nagorikpathagar.org

এক সঙ্গে তার চেয়ে অনেক বেশি আহার সংগ্রহ করতে পারত। এইরূপ সমষ্টিবদ্ধভাবে অথবা পরস্পরের সাহায্যে আমরা এমন সব কাজ করতে পারি, যা একলা করা অসম্ভব। দুই-একজন লোকের পক্ষে যে ভারী বোঝাটা বহন করা অসম্ভব, কয়েকজন মিলে ধরলে সেই বোঝাটাই আবার খুব হালকা হয়ে যায়। কৃষির কথা তোমাকে এর আগে বলেছি, এ-ও মানুষের সেদিনের একটা মস্ত আবিষ্কার। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে, কোনো কোনো জাতের পিঁপড়ার মধ্যেও কৃষির সূচনা হয়েছে। অবশ্য আমি বলছি না যে ওরা মাটি চাষ করে, বীজ বোনে, তার পর শস্য হলে তা কেটে নেয়। এরা কী করে জানো? এরা যদি দেখে, যে সব ছোট গাছের বীজ এরা খায়, তার চারদিকে ঘাস জন্মেছে, তবে সেই ঘাসগুলি ওরা বেশ যত্ন করে তুলে ফেলে। এই ভাবে ওরা ঐ গাছগুলির বাঁচবার সুবিধা করে দেয়।

এই পিঁপড়াগুলি আজ যেরকম করে, মানুষও একদিন হয়তো তাই করত। সেই প্রথম অবস্থায় কৃষি সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। বীজ বপন করে শস্য জন্মাবার মতো বুদ্ধি মাথায় আসতে মানুষের অবশ্য বহুদিন কেটে গেল।

কৃষিকাজের আরম্ভের সঙ্গে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারটাও অনেক সহজ হয়ে গেল। খাদ্যের জন্য দিনরাত শিকার করবার প্রয়োজন ছিল না, কাজেই তার জীবন-যাত্রার দিনগুলিও অনেক সহজ হল। কৃষিকার্য আরম্ভ হবার আগে মানুষ ছিল শিকারি। পুরুষদের ঐ এক কাজই ছিল। স্ত্রীলোকেরা হয়তো ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করত, আর ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করত। কিন্তু কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আরো নানারকমের কাজেরও সৃষ্টি হল– যেমন মাঠের কাজ, বনে শিকার, গৃহপালিত পশুগুলির দেখাশুনা, ইত্যাদি। খুব সম্ভব, গৃহপালিত পশুগুলির দেখাশুনা, দুধ দোহানো– এগুলি ছিল মেয়েদের কাজ। পুরুষদের মধ্যেও হয়তো এক-একজন এক-একটি কাজ করত।

পৃথিবীতে আজকাল প্রত্যেক লোকেরই জীবিকা নির্বাহের এক-একটি আলাদা ব্যবসা আছে; যেমন ধর কেউ ডাক্তার– চিকিৎসা করে; কেউ ইঞ্জিনিয়ার– রাস্তা তৈরি করে, পুল তৈরি করে: কেউ ছুতার, কেউ কর্মকার; আবার কেউ বা রাজমিস্ত্রি– বাড়ি প্রস্তুত করে; কেউ মুচি, কেউ বা দরজি, এমনি সব। তবেই দেখ, প্রত্যেকেরই এক-একটি বিশিষ্ট ব্যবসা আছে, আর অন্য কোনো ব্যবসা সম্বন্ধে তার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। একেই আমরা বলি কর্ম-বিভাগ। কেউ যদি একাই অনেকগুলি কাজ শিখবার চেষ্টা না করে একটি কাজই ভালো করে করবার চেষ্টা করে, সে সেই কাজটি নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন করতে পারবে। পৃথিবীতে এই কর্ম-বিভাগ আজকাল খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায়।

কৃষিকার্যের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কর্ম-বিভাগের পদ্ধতিটাও আদিম জাতিগুলির মধ্যে ঢুকেছিল।

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতার ধাত্রী—কৃষি

আমার আগের চিঠিতে কর্ম-বিভাগের কথা কিছু কিছু বলেছি। একেবারে প্রথম যুগে মানুষ যখন কেবল শিকার করে তার আহার সংগ্রহ করত, তখন এই কর্ম-বিভাগের বড় একটা প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেককেই শিকার করতে হত, আর ভরপেটের খাবার জোগাড় করতে যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হত এই কর্ম-বিভাগের সূচনা হয়েছিল প্রথম পুরুষ আর স্ত্রীলোকের মধ্যে– পুরুষেরা বাইরে শিকার করত, মেয়েরা বাড়িতে থেকে ছেলেমেয়ে আর গৃহপালিত পশুপাখির দেখাশুনা করত।

কৃষির সূচনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও নানা দিকে নানা রকমের নূতন নূতন উন্নতি হতে লাগল। আর তখন থেকে একটু ব্যাপকভাবে কর্মবিভাগও আরম্ভ হল। কেউ শিকার করত, আবার কেউ বা মাঠের কাজ করত, মাটি চাষ করত। তারপর যতই দিন যেতে লাগল, মানুষও নানা রকমের নূতন নূতন শিল্প শিখে তাতে বিশেষজ্ঞ হতে লাগল।

পৃথিবীর ইতিহাস ৪১ ৫২

www.nagorikpathagar.org

এই কৃষির উদ্ভাবনের অপর একটি প্রধান ফল এই হল যে, মানুষেরা গ্রামে এবং শহরে বসবাস আরম্ভ করল। কৃষিকাজ আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত মানুষ নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত, আর শিকার করে জীবনধারণ করত। একই স্থানে বসে থাকবার তাদের কোনো প্রয়োজন ছিল না, যেখানেই যেত, সেখানেই তাদের শিকার মিলত। এ রকমভাবে ঘুরে বেড়াবার অবশ্য আরেকটা কারণও ছিল। তাদের সঙ্গের গরু, ভেড়া ও অন্যান্য পশুদেরও চরবার ভূমির দরকার; অনেক দিন এক জায়গায় থাকলে পশুগুলির ঘাসের অভাব হত, কাজেই সমস্ত দলটিকে অন্য জায়গায় সরে যেতে হত।

কিন্তু মানুষ যখন মাঠ চষে কৃষি কাজ আরম্ভ করল, তখন সেই চাষ-করা জমির নিকটে থাকা তাদের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। জমি চাষ করে, বীজ বুনে, সেই জমি ফেলে দূরে সরে যাওয়া আর কিছুতে চলে না। কাজেই, শস্যবপনের সময় থেকে শস্য কাটা পর্যন্ত তাদের এক জায়গাতেই সুস্থির হয়ে থাকতে হত, এ রকম করে আস্তে আস্তে শহর, গ্রাম সব গড়ে উঠল।

কৃষির দ্বারা মানুষের আর-এক প্রধান উপকার এই হল যে, তার জীবনযাত্রার দিনগুলি অনেক সহজ হল সারাদিন ধরে কেবল শিকার করার চেয়ে জমি চাষ করে শস্য উৎপাদন করা অনেক সহজ। জমিতে যে শস্য জন্মাত, তা তো আর একবারে খেয়ে শেষ করা যেত না, কাজেই যেটা বাকি থাকত তা সঞ্চয় করে রাখা হত।

www.nagorikpathagar.org

এবার মানুষের উন্নতির পরের ধাপটা দেখা যাক। যখন শিকারই ছিল মানুষের একমাত্র জীবিকা, তখন তার পক্ষে একরকম কিছুই সঞ্চয় করা সম্ভব ছিল না, যদিই বা সে কিছু সঞ্চয় করত, তা অতি সামান্য। সে-দিন তার জীবনযাপনের পদ্ধতিটা ছিল কোনো রকমে 'এনে-নিয়ে-খেয়ে' থাকা। ধনসম্পত্তি তো তার আর কিছু ছিল না, আর তা জমা রাখবার কোনো ব্যাংকও অবশ্য ছিল না। প্রত্যেক দিনের আহার তাকে শিকার করে সংগ্রহ করতে হত। কিন্তু যখন সে মাটি চাষ করে শস্য জন্মাতে আরম্ভ করল, তখন অবশ্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর খাদ্যই সে পেত। এই অতিরিক্ত খাদ্য অথবা শস্য সে সঞ্চয় করে রাখত, এই থেকে আরম্ভ হল খাদ্যের অতিরিক্ততা। একটু বেশি পরিশ্রম সে করতই, কাজেই ঘরেও তার কিছু শস্যের সঞ্চয় হত।

আজকাল অনেক ব্যাংকের সৃষ্টি হয়েছে। লোকেরা সেখানে তাদের টাকা জমা রাখে, আর প্রয়োজন মতো চেক কেটে জমা টাকা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু ব্যাংকে এসে এই টাকা জমা হয় কেন? একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে, এই টাকাটা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অর্থাৎ ঐ টাকার মালিক একবারেই সমস্ত টাকাটা খরচ করে ফেলতে চায় না, কাজেই ব্যাংকে জমা রাখে। যে ধনী, তার হাতে রয়েছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যথেষ্ট টাকা, আর যে দরিদ্র তার নেই কিছুই। এর পরে দেখবে, এই অতিরিক্ত টাকার উৎপাদন হয় কেমন করে? একজন আর একজনের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করলেই যে অতিরিক্ত ধনের অধিকারী হবে এমন নয়, বরং আজকালের দিনে, যে মোটেই পরিশ্রম করে না তার হাতেই এসে অতিরিক্ত টাকা জমা হয়, আর যে উপার্জনের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে, তার কপালে জোটে না কিছুই ; এটাকে কী খুব অন্যায় বিধান বলে তোমার মনে হয় না? অনেকেরই ধারণা, এই অন্যায় বিধির জোরেই পৃথিবীতে দরিদ্রের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে। এ-কথাগুলি বুঝতে হয়তো তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে। কঠিন মনে হলে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, আরেকটু বড় হলেই এসব কথা বুঝবে।

এখনকার মতো এই কথাটাই মনে রেখ– কৃষির ফলে, একবারে যা খেয়ে শেষ করা যায়, তার চেয়ে শস্যের ফলন হত অনেক বেশি। এই বেশিটুকুই সঞ্চয় করা হত। সেই দিনে অর্থও ছিল না, ব্যাংকও ছিল না। যার অনেক গরু, ভেড়া, উট অথবা শস্য ছিল, তাকেই বলা হত ধনী।

www.nagorikpathagar.org

দলপতির গল্প

আমার ভয় হচ্ছে চিঠিগুলি যেন তোমার পক্ষে ক্রমেই একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের চারদিকের জীবনযাত্রাও তো কম জটিল নয়। আদিম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অনেক সহজ সরল। এখন আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করছি, তখন থেকেই মানুষের জীবনে জটিলতা আরম্ভ হয়েছে। তোমাকে এখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হতে হবে, প্রত্যেক ধাপে মানুষের জীবনে এবং সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে, তাই তোমাকে বুঝতে হবে, তবেই বর্তমানের অনেক কথা তোমার পক্ষে বোঝা সহজ হবে। এর রকম ধীরে ধীরে বুঝতে চেষ্টা না করলে আমাদের চারদিকে আজ যেসব ঘটনা ঘটছে, তার কিছুই তুমি বুঝতে পারবে না। মনে হবে যেন বনের আঁধারে ছোট শিশুর মতো পথ হারিয়ে ফেলেছ। তাই আমি তোমাকে একেবারে বনের এক প্রান্ত সীমায় নিয়ে এসেছি, যেন তুমি পথ খুঁজে পাও।

তোমার হয়তো মনে আছে, মুসৌরিতে তুমি একদিন আমাকে রাজাদের কথা জিজ্ঞেস করে জানতে চেয়েছিলে, তারা কী, আর রাজাই বা হল কেমন করে? এই রাজাদের সৃষ্টি হয়েছে বহু দিন আগে, সেই প্রাচীন যুগের দিকে এখন আমরা একবার উঁকি মেরে দেখব। প্রথমেই অবশ্য মানুষ রাজা বলে কাউকে অভিহিত করে নাই। সেই যুগের বিষয় এখন একটু শোন, তবেই রাজাদের উৎপত্তির ইতিহাসটাও বুঝতে পারবে।

ছোট ছোট দল যে কেমন করে গড়ে উঠল, তা তোমাকে আগেই বলেছি। যখন থেকে কৃষির সূচনা হল, তখন থেকেই কর্মবিভাগেরও সূত্রপাত হল। কাজেই কাজকর্মের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, দলের মধ্যে একজন লোক বিশেষের প্রয়োজন হল। এর আগেও কিন্তু দুই দলে যখন যুদ্ধ বাধত, তখন দলের লোকেরা, যুদ্ধে নেতৃত্ব করবার জন্য একজন করে নেতা ঠিক করে নিত। দলের সবচেয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিই ছিল দলের নেতা। তাকে বলা হত, অর্থাৎ আমরা এখন তার নাম দিয়েছি গোষ্ঠীপতি (Patriarch)। সবচেয়ে যে বৃদ্ধ তাকেই সবাই মনে করত সবচেয়ে জ্ঞানী আর অভিজ্ঞ। এই দলপতি কিন্তু প্রথম অবস্থায় দলের অন্যান্যদের চেয়ে বিশিষ্ট কেউ ছিল না। সে-ও দলের আর সকলের সঙ্গে সমানভাবে কাজকর্ম করত এবং যে খাদ্য উৎপন্ন হত, তা-ও সবাইয়ের জন্য সমান ভাগ করা হত। সমবেতভাবে ঐ

www.nagorikpathagar.org

দলটি যাবতীয় জিনিসের অধিকারী ছিল। আজকাল যেমন সকলেরই যার যার নিজ নিজ বাড়িঘর, ধন-সম্পত্তি এবং আরও সব নানা জিনিস রয়েছে, সে-যুগে কিন্তু তেমন ছিল না। দলের যে-কেউ যা-কিছু অর্জন করত, তারই ভাগ হত, কারণ, সমস্তই ছিল দলের অধিকারে। এই ভাগ করার কাজটাই দলপতি করে দিত।

তারপর, ধীরে ধীরে পরিবর্তন শুরু হল। কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আরও নূতন নূতন কাজও জুটে গেল। দলপতির তখন বেশির ভাগ সময় কেটে যেত ঐ সব কাজকর্মের শৃঙ্খলা বিধানে, আর দলের সবাই নিজ নিজ নির্দিষ্ট কাজ করছে কিনা, তার দেখাশুনা করতে। তাই দলপতি ক্রমে ক্রমে সাধারণ কাজকর্ম অর্থাৎ অন্যান্যদের মতো পরিশ্রম করা, একেবারেই ছেড়ে দিল। এমনি করে ঐ দলপতি শেষপর্যন্ত দলের অন্যান্যদের চেয়ে নিজে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল। কর্ম-বিভাগের আরেকটি নূতন ধারায় এসে আমরা এখন পৌঁছুলাম। দলপতির কাজ হল– কাজকর্মের শৃঙ্খলা সম্পাদন করা, আর দলের লোকদের আদেশ দেওয়া। দলের লোকদের কাজ হল– কৃষিকার্য করা, শিকার করা, যুদ্ধে যাওয়া এবং দলপতির আদেশ পালন করা। যুদ্ধের সময় দলপতির ক্ষমতা ছিল আরও বেশি, কারণ, সেনাপতি ছাড়া ভালো করে যুদ্ধ করা চলে না। এমনি করেই দলপতি আস্তে আস্তে খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল

দলে শৃঙ্খলা বিধানের কাজ ক্রমেই বেড়ে গেল, দলপতিরও আর একাকি সকল কাজ করা সম্ভব ছিল না, কাজেই সহকারী হিসাবে তিনি দল থেকে আরও কয়েকজনকে বেছে নিলেন। এই সহকারীর সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেল। এবার দেখ, দলের মধ্যে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হল– পরিচালক আর সাধারণ কর্মী। মানুষের সাম্য ভেঙে গেল, প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল।

দলপতির ক্ষমতা যে ক্রমে ক্রমে কেমন করে বেড়ে গেল, সে-কথা তোমাকে পরের চিঠিতে লিখব।

www.nagorikpathagar.org

দলপতির আরো গল্প

সেই বহু যুগ আগের দল আর দলপতির গল্পটা হয়তো তোমার নেহাত মন্দ লাগছে না।

তোমাকে আগের চিঠিতে লিখেছি, প্রথম অবস্থায় সমগ্র দলটিই ছিল সমবেত ভাবে সমস্ত সম্পত্তির মালিক। দলের কারুরই নিজস্ব সম্পত্তি বলে কোনো জিনিস ছিল না, এমনকি দলপতিরও নয়। দলের একজন হিসাবে সে-ও একজন অংশীদার ছিল, এই মাত্র। কিন্তু সেই ছিল দলের কর্তা, কাজেই বিষয়সম্পত্তির দেখাশুনাও তাকেই করতে হত। তারপর আস্তে আস্তে তার ক্ষমতা যতই বাড়তে লাগল, সেও মনে করতে আরম্ভ করল যে সে নিজেই সমস্ত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিক, দলের সবাইকে আর অংশীদার বলে মানতে সে রাজি হল না। অথবা এ-ও হতে পারে, যে সে মনে করতে আরম্ভ করল, দলপতি হিসাবে সেই হল দলের সার্বভৌম প্রতিনিধি। এইভাবেই মানুষ নিজকে সম্পত্তির মালিক বলে প্রথম ভাবতে শিখল। 'তোমার', 'আমার' এই বলে আজকাল আমরা সব জিনিসের নির্দেশ করি। কিন্তু তোমাকে তো বলেছি, দল সৃষ্টির প্রথম যুগে কেহই এই কথা ভাবতো না। সেই দিনে দলই ছিল সমস্ত জিনিসের মালিক। বৃদ্ধ দলপতির হয়তো এই কথাই একদিন মনে হল যে তাঁর নামেই তো দলের পরিচয়, কাজেই সমস্ত বিষয়সম্পত্তির মালিকও তিনি স্বয়ং।

বৃদ্ধ দলপতি মরে যাওয়ার পর দলের সবাই মিলে আর একজনকে দলপতি বলে মেনে নিল। কিন্তু দলপতির পরিবারের লোকদেরই দল পরিচালনার বিষয় সব ভালো জানা ছিল। দলপতির সঙ্গে তারা সর্বক্ষণ থাকত, আর কাজকর্মেও তাঁকে সাহায্য করত, কাজেই এই বিষয়ে অন্যদের চেয়ে তাদেরই বেশি অভিজ্ঞতা ছিল। তাই, কোনো দলপতির মৃত্যু হলে দলের লোকেরা তখন সেই পরিবারেরই কাউকে দলপতি বলে মেনে নিত। কাজেই দেখ, দলপতির নিজ পরিবারের লোকেরা অন্যান্যদের চেয়ে একটু বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়াল। তারপর আরেক কথা, দলপতির নিজেরও যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কাজেই তিনি চাইতেন তাঁর মৃত্যুর পর যেন তাঁর ছেলে অথবা ভাই সেই স্থান অধিকার করে। এরকমটি ঘটাবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করতেন। তিনি ছেলে অথবা ভাই অথবা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়কেই এই কাজে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে যেতেন, যেন তাঁর অবর্তমানে সে-ই তাঁর স্থান অধিকার করতে পারে। তিনি হয়তো দলের মধ্যে এ কথাও প্রকাশ করতেন যে, তিনি যাকে

www.nagorikpathagar.org

পছন্দ করে শিক্ষিত করে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাকেই নির্বাচিত করতে হবে। প্রথম প্রথম দলের লোকেরা নিশ্চয়ই এ রকম আদেশ পছন্দ করত না, কিন্তু ক্রমে এই আদেশ পালনে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত দলপতির আদেশ পালনে তাদের কোনো দ্বিধা বোধ হত না। কাজেই দলপতি মনোনয়নের ব্যবস্থাটা ক্রমে উঠেই গেল, কারণ বুড়ো দলপতির মৃত্যুর পর কে যে দলপতি হবে, তা তো আগেই স্থির হয়ে আছে।

এমনি করেই এই দলপতিত্ব আস্তে আস্তে বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র অথবা অন্য কোনো নিকট আত্মীয়ের হাতেই এই অধিকারটি যেতো। দলপতি মহাশয় এবার ঠিক-ঠিকই ভেবে নিলেন, দলের বিষয়সম্পত্তির মালিকও তিনিই স্বয়ং, কাজেই তাঁর মৃত্যুর পরও সম্পত্তিটা তাঁর পরিবারের লোকদের অধিকারেই থেকে যেত। এমনি করে মানুষের মনে 'আমার জিনিস' 'তোমার জিনিস' এই ভাব গড়ে উঠল। প্রথম অবস্থায় কিন্তু মানুষের এই জ্ঞান ছিল না; দলের সবাই একযোগে দলের জন্য উপার্জন করত, কারুর একার জন্য নয়। তাদের সমবেত চেষ্টায় যে ফসল বা দ্রব্যাদি উৎপন্ন হত তাই সকলের মধ্যে ভাগ করা হত। দলের মধ্যে ধনী দরিদ্র বলে কোনো কথা ছিল না। প্রত্যেকেই ছিল দলের সম্পত্তির এক একজন অংশীদার।

কিন্তু যখন থেকে দলের সম্পত্তির উপর দলপতির হস্তক্ষেপ আরম্ভ হল, তখন থেকেই ধনী দরিদ্রেরও সৃষ্টি হল।

আমার পরের চিঠিতে এই বিষয় নিয়ে আরও বলব।

www.nagorikpathagar.org

দলপতির রাজ্যাভিষেক

ঐ বুড়ো দলপতির গল্প নিয়ে কিন্তু অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছি। শিগ্‌গিরই তার কথা শেষ করব; আচ্ছা, বরং তার নামটা এবার বদলে দিচ্ছি। রাজাদের সৃষ্টি হল কেমন করে, আর তারা কী, এ সব কথা বলব বলেই দলপতির গল্প আরম্ভ করেছিলাম। রাজাদের কথা জানতে হলে, সেই পুরানো যুগের দলপতিদের কথাই আগে বুঝতে হবে। তুমি হয়তো এতক্ষণে কতকটা আঁচ করে নিয়েছ, এই দলপতিরাই শেষ পর্যন্ত রাজা, মহারাজা হয়ে দাঁড়াল। Patriarch শব্দটা ল্যাটিন ভাষার pater (ইংরেজি father) শব্দ থেকে এসেছে। এই Patriarch-ই ছিলেন তাঁর দলের দলপতি অর্থাৎ তিনিই ছিলেন যেন তাঁর দলের লোকদের পিতা। Patria অর্থ পিতৃভূমি, এই শব্দটিও ঐ ল্যাটিন "Patrie" থেকে এসেছে। তুমি তো জানই ফরাসি ভাষায় এই শব্দটি হল "Pater," সংস্কৃত এবং হিন্দি ভাষায় কিন্তু আমরা বলি মাতৃভূমি, কারণ দেশকে আমরা মা'র মতোই দেখি। তোমার কোন্‌টি ভালো লাগে তা বল তো?

এই দলপতিত্ব যখন পিতার পরে পুত্রের হাতে যেতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ যখন বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল, তখন রাজা আর দলপতির মধ্যে কিন্তু কোনো তফাতই রইল না। এই দলপতিই আস্তে আস্তে রাজায় পরিণত হল। রাজা হয়ে তাঁর মনে এই অদ্ভুত ধারণা জন্ম নিল যে, দেশের যত কিছু সবের মালিকই তিনি। তিনি মনে করতে আরম্ভ করলেন, দেশ বলতে তাঁকেই বুঝায়। একজন প্রসিদ্ধ ফরাসি রাজা এক সময় বলেছিলেন—"L'etat c'est moi," অর্থাৎ 'রাজ্য মানেই আমি'। রাজা ভুলে গেলেন যে, তিনি প্রজাদের দ্বারাই মনোনীত হয়েছিলেন। প্রজারা তাঁকে মনোনীত করেছিল, কাজকর্মের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য, আর খাদ্যাদি সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্য। তিনি এ-ও ভুলে গেলেন যে দলের মধ্যে অথবা দেশের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান মনে করেই জনসাধারণ তাঁকে মনোনীত করেছিল। রাজাদের মনে হল তাঁরা প্রভু, আর দেশের সব লোক তাঁদের ভৃত্য। আসলে কিন্তু তাঁরাও দেশ আর দেশের লোকদের সেবক ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর পরে যখন ইতিহাসের বই পড়বে, তখন দেখবে রাজারা শেষ পর্যন্ত এতই স্বার্থপর হয়ে দাঁড়াল যে, তারা মনে করতে আরম্ভ করল যে দেশের লোকদের রাজা-মনোনয়নের কোনো অধিকার নেই। তারা বলত যে ভগবানই তাদের রাজা করে

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি করেছেন, রাজা হওয়া ভগবানদত্ত অধিকার। বহুকাল যাবৎ এই রাজার দল বহু অনাচার করে এসেছে। প্রজারা না খেয়ে মরেছে, সেদিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না, নিজেরা বিলাস ঐশ্বর্যে কাটিয়েছে। কিন্তু এরকম অত্যাচার আরো লোকে কতকাল সহ্য করবে? কোনো কোনো দেশের প্রজারা ত্যক্ত হয়ে রাজাদের তাড়িয়ে দিল। ইংল্যান্ডের লোকদের রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, রাজার পরাজয়, তাঁর হত্যা: প্রসিদ্ধ ফরাসি বিদ্রোহের কথা; এসব তুমি আরেকটু বড় হয়ে পড়বে। ফরাসিরা তো ঠিক করল তাদের দেশে তারা আর রাজা রাখবে না। তোমার হয়তো মনে আছে, প্যারিতে আমরা কঁসিয়েরজ্ (Conciergerie) জেলখানা দেখতে গিয়েছিলাম। তুমি ছিলে তো আমাদের সাথে? রানি মারী আন্টয়নে এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্যদের এই জেলখানায় বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এই তো কয়েক বৎসর আগেকার প্রসিদ্ধ রুশবিদ্রোহের কথা, তার ইতিহাস ও তুমি পড়বে। রাশিয়ার লোকেরা তো তাদের রাজা জারের বংশই লোপ করে দিয়েছে।

এইভাবে রাজাদের ওপর প্রতিশোধ তোলা হয়েছিল, তাদের আর এখন সেই দিন নেই। এখন অনেক দেশেই রাজা নেই। ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড, আমেরিকা, চীন এবং আরও অনেক দেশে রাজা নেই। এগুলি সব প্রজাতান্ত্রিক দেশ অর্থাৎ কয়েক বৎসর পর দেশের জনসাধারণ নিজেদের শাসনকর্তা অথবা নেতা নির্বাচন করে। এই শাসনকর্তার চাকুরিটি বংশানুক্রমিক নয়।

ইংল্যান্ডে অবশ্য এখনও রাজা আছেন, কিন্তু রাজা হিসাবে তাঁর নিজের হাতে ক্ষমতা খুব অল্পই আছে। সমস্ত ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে। পার্লামেন্টের সমস্ত সভ্যই জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। লন্ডনের পার্লামেন্ট যে দেখেছিলে তোমার মনে আছে তো?

ভারতবর্ষে কিন্তু এখনও অনেক রাজা, মহারাজা, নবাব রয়েছেন। তাঁদের দেখবে দামি মোটর হাঁকিয়ে, শৌখিন জামা কাপড় পরে চলাফেরা করে। নিজেদের বাবুগিরির জন্য খরচের আর অন্ত নেই। এই বাবুগিরি করবার টাকা এরা কোথায় পায় জান? প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হয়। কিন্তু রাজাকে তো খাজনা দেওয়া হয়, যেন দেশের সর্বসাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে সেই টাকা খরচ করা হয়: স্কুল করা, হাসপাতাল করা, লাইব্রেরি মিউজিয়াম করা, ভালো ভালো রাস্তা তৈরি করা– এই সব হিতকর অনুষ্ঠানের কথাই আমি বলছি। কিন্তু আমাদের দেশের রাজা মহারাজার দল আজও সেই ফরাসি দেশের রাজার মতোই মনে করেন– L'etat c'est moi– রাজ্য মানেই তো আমি। প্রজাদের অর্থ তারা নিজেদের আমোদ-প্রমোদে খরচ করে। রাজারা আছে সব বিলাসিতায় ডুবে, আর রাজ্যের প্রজারা, যারা তাদের এই অর্থ যোগায়, তারা মরে উপবাস করে অর্থাভাবে, আর তাদের ছেলেরা মূর্খ হয়ে থাকে স্কুলের অভাবে।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন সভ্যতা

দলপতি আর রাজাদের কথা মোটামুটি যথেষ্ট বলা হল। এবার পেছন ফিরে আরেকবার তাকান যাক এবং প্রাচীন সভ্যতা, আর সেদিনের লোকদের কথাই কিছু আলোচনা করা যাক।

প্রাচীন যুগের সভ্য লোকদের কথা অবশ্য আমরা খুব বেশি কিছু জানি না, কিন্তু তবু আদি ও নব প্রস্তর-যুগের (Palaeo-lithic and Neo-lithic) মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি জানি। হাজার হাজার বৎসর আগেকার পুরানো মস্ত মস্ত দালান কোঠার ভগ্নাবশেষ আজ পর্যন্তও পাওয়া যায়। এই পুরানো মন্দির প্রাসাদগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলে আমরা সেই যুগের মানুষ আর তাদের অনুষ্ঠিত কার্যাবলী সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করতে পারব। ঐ সব দালানের গায়ের খোদিত কারুকার্য আর পাষাণ মূর্তিগুলির মধ্যে সেই যুগের অনেক নিদর্শন রয়ে গেছে। ঐ মূর্তিগুলি থেকেই আমরা সেই দিনের মানুষদের পোশাকপরিচ্ছদ এবং আরো নানা বিষয়ের পরিচয় পাই।

একেবারে প্রথম, মানুষ যে কোথায় ঘরদোর বেঁধে বসবাস আরম্ভ করেছিল, আর কোন্ দেশে যে মানবের আদিম-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ঠিক করে বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন আটলান্টিক সাগরের মধ্যে আটলান্টিস্ নামে একটা মস্ত বড় দেশ ছিল। সেই দেশের লোকেরা নাকি খুব সভ্য ছিল। কিন্তু দেশটার কোনো চিহ্নই অবশ্য আজ আর নেই, সমস্ত দেশটাই আটলান্টিকের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। এই দেশটা সম্বন্ধে অবশ্য কতকগুলি প্রচলিত গল্প ছাড়া আর কোনো প্রমাণই নেই। কাজেই এর কথা আমরা ছেড়েই দেব।

আবার কারোর কারোর মতে প্রাচীনকালে আমেরিকাতেও কতকগুলি সুসভ্য জাতির বাস ছিল। তুমি জানো, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন বলে একটা প্রচলিত কথা আছে। এ কথার অর্থ এই নয় যে কলম্বাসের আগে আমেরিকার অস্তিত্ব ছিল না; আসলে, ইউরোপের লোকেরা কলম্বাসের আগে ঐ দেশটার কথা জানত না। কলম্বাসের যাবারও বহু পূর্বে সেই দেশে মানুষের বাস ছিল, এবং তাদের ও একটা সভ্যতা ছিল।

উত্তর আমেরিকার ম্যাক্সিকো প্রদেশের ইয়ুকাটান (Yukatan) এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরু শহরে কতকগুলি পুরানো দালান-কোঠার ভগ্নাবশেষের চিহ্ন

www.nagorikpathagar.org

পাওয়া গেছে। কাজেই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, অতি প্রাচীন কালে ইয়ুকাটান এবং পেরুতে খুব সভ্য লোকদের বাস ছিল। কিন্তু ওদের কথা খুব বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়, কারণ তাদের বিষয় বিস্তারিত এখনও কিছুই জানা যায় নাই। হয়তো ভবিষ্যতে এদের বিষয় আরো অনেক জানা যাবে।

ইউরোপ ও এশিয়াকে একত্রে বলা হয় ইউরেশিয়া। ইউরেশিয়ায় প্রাচীনতম সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছিল, মেসোপেটেমিয়া, মিশর, ক্রিট, ভারতবর্ষ এবং চীন দেশে। মিশরকে অবশ্য এখন আফ্রিকার মধ্যে ধরা হয়, কিন্তু খুব কাছাকাছি বলে আমরা একে ইউরেশিয়ার মধ্যেই ধরেছি।

সেই প্রাচীন যাযাবর জাতিগুলি যখন ঘরদোর বেঁধে বসবাস আরম্ভ করল, কী রকম দেশ তারা বেছে নিল বলতো? যেই সব স্থানে তাদের খাদ্যাদি খুব সহজ প্রাপ্য ছিল, সেই সব স্থানই অবশ্য তাদের পছন্দ হল। তাদের খাদ্যের কতকটা অংশ ছিল কৃষিজাত। আবার কৃষির জন্য জলের প্রয়োজন খুব বেশি। জলের অভাবে সব মাঠ শুকিয়ে যায়, মাঠে আর কোনো শস্য জন্মে না। কৃষির জন্য জলের যে কত প্রয়োজন তা তো এই থেকেই বুঝতে পার যে, মৌসুমের সময় ভারতবর্ষে যথেষ্ট বৃষ্টি না হলে, ভালো ফসল জন্মে না, দেশেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অন্নাভাবে দরিদ্রেরা উপোস করে মরে। কাজেই তুমি অবশ্যি বলবে, প্রাচীন যুগের মানুষেরা বসবাসের নিমিত্ত নদীমাতৃক দেশগুলিকেই পছন্দ করেছিল। –হ্যাঁ ঠিক তাই।

মেসোপোটেমিয়ায় টাইগ্রিস্ ও ইয়ুফ্রেটিস্ নদীর মাঝের ভূখণ্ডে, আর মিশরে নীলনদের তীরে তারা তাদের বাসা বেঁধেছিল। ভারতবর্ষেও বেশির ভাগ শহরই গড়ে উঠেছিল, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা এসব বড় বড় নদীর তীরে। জল তাদের এত প্রয়োজনীয় ছিল যে, তারা তাদের অন্নদাতা, ঋদ্ধিদাতা নদীগুলিকে বড়ই পবিত্র মনে করত। মিশরিরা নীলনদকে 'পিতা নীল' বলে পূজা করত। ভারতবর্ষেও গঙ্গা নদীকে পূজা করা হত, আর এখনও একে খুব পবিত্র মনে করা হয়। একে বলা হয় 'গঙ্গা মাঈ'। তীর্থযাত্রীরা যে 'গঙ্গা মাঈকী জয়' ধ্বনি করে তা তো তুমি শুনেছ। কেন যে ওরা নদীকে পূজা করত তা বুঝা কঠিন নয়– নদী যে তাদের বড় হিতকারী ছিল। জল ছাড়াও অপর একটি জিনিস– পলিমাটি– এই নদীর কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই পলিমাটিই ফসল ক্ষেতগুলিকে উর্বর করে। নদীর জল, আর এই পলিমাটির গুণেই ক্ষেত্রগুলি প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। কাজেই নদীগুলিকে 'পিতা' 'মাতা' বলা কিছুই অন্যায় নয়। কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধটা ভুলে যাওয়া মানুষের একটা অভ্যাস, একটুকুও না ভেবেই তারা পূর্বপুরুষের অনুকরণ করে যায়। এ কথা মনে রেখ, নীলনদ ও গঙ্গানদী মানুষকে অন্ন জল দিত বলেই তাদের পবিত্র মনে করা হত।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন যুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগর

আমরা জানি মানুষেরা প্রথম তাদের বসবাস শুরু করেছিল বড় বড় নদী আর উর্বর উপত্যকার ধারে, কারণ, সেই সব স্থানেই অন্ন জলের প্রাচুর্য ছিল। বড় বড় নগরগুলি ছিল সবই নদীর তীরে। তুমি হয়তো খুব প্রাচীন কতকগুলি নগরের নাম শুনেছ। মেসোপোটেমিয়ায় এরকম কতকগুলি নগর ছিল– বেবিলোন, নিনেভা, আসুর। কিন্তু এসব শহরগুলি যে লোপ পেয়ে গেছে, সেও আজ বহু দিনের কথা; তবে এদের ভগ্নাবশেষ বহু দূর নিচে বালু আর মাটি খুঁড়লে আজও পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বৎসরের নানারূপ বিপর্যয়ের ফলে ঐ নগরগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে বালু আর মাটির নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। কোনো কোনো স্থানের আবার ঐ ঢেকে-যাওয়া নগরগুলির মাথার ওপর নূতন আরেকটা শহর গড়ে উঠেছিল। এই সব প্রাচীন নগরের সন্ধানী যারা, তারা অনেক দূর পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে দেখেছে পর পর একটার মাথায় আর একটা, এরকম ভাবে অনেকগুলি শহর গড়ে উঠেছে। অবশ্য একই সময়ে মাথায় মাথায় চড়ে কতকগুলি শহর এক সঙ্গে গড়ে ওঠে নাই। বহু শত বৎসর ধরে হয়তো একটা শহরের অস্তিত্ব ছিল, যে-সব মানুষ প্রথম সেখানে বাস করত তারা মরে গেল, তাদের ছেলে, ছেলেদের ছেলে তারাও তাদের জন্ম-মৃত্যুর খেলা ওখানেই শেষ করল। তারপর হয়তো কোনো কারণ বশত ক্রমে ক্রমে বহু লোক ঐ শহর ছেড়ে চলে গেল। শহরটা শেষে একদিন একেবারেই জন-প্রাণী শূন্য হয়ে গেল। কতকগুলি ভগ্ন স্তূপ ছাড়া শহরটার আর কিছুই বাকি রইল না। জনপ্রাণী শূন্য সেই ভাঙ্গা শহরটাও আস্তে আস্তে ধূলা মাটির নিচে ঢাকা পড়ে গেল। কয়েক শত বৎসরে শহরটা মাটির নিচে এমনভাবে ঢেকে গেল যে, ওখানে যে একটা শহর ছিল সে কথাও লোকে ভুলে গেল। আরো বহুকাল পরে কতকগুলি নূতন লোক এসে আবার ওখানেই আরেকটা নূতন শহর গড়ে তুলল। এই শহরটাও একদিন আগেরটার মতো প্রাচীন হয়ে গেল, সব লোক শহর ছেড়ে চলে গেল, আর শহরটাও তার ভাঙ্গা চিহ্ন বুকে করে পড়ে রইল। সেই ভাঙ্গা চিহ্নটুকুও আবার দিনে দিনে ধূলা বালির নিচে ঢাকা পড়ে গেল। একটার ওপর আর একটা এরকম অনেকগুলি শহরের ভগ্নাবশেষ একই জায়গায়, আজকাল আমরা দেখতে পাই। এরকম ঘটনা বালুময় দেশেই বিশেষভাবে ঘটেছে, কারণ সব জিনিসই বালুতে খুব শিগ্‌গির ঢাকা পড়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

১৯৫৬ সালে আবিষ্কৃত প্রস্তরযুগের একটি স্থান। Sanwan নদীর উত্তরদিকের দৃশ্য।

এ কেমন আশ্চর্য ভেবে দেখ তো– বহু নরনারী শিশুর বাসভূমি শহরগুলি, একটির পর একটি করে গড়ে উঠল, আর আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেল। পুরাতনের জায়গায় নূতনের সৃষ্টি হল, নূতন জনস্রোত এসে আবার তাদের বাসা বাঁধল, মৃত্যুর স্পর্শে তারাও একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেয়ে গেল। এসব প্রাচীন শহরগুলির কাহিনী তো তোমাকে কয়েকটি কথায় শেষ করে দিলাম; কিন্তু একবার ভেবে দেখতো কত সহস্র বৎসর লেগেছিল এই শহরগুলি গড়ে উঠতে, লোপ পেতে, আবার তারই জায়গা নূতনের সৃষ্টি হতে।

জীবনের সত্তর আশি বৎসর পার হলেই মানুষ বৃদ্ধ হয়, কিন্তু এই সহস্র সহস্র বৎসরের তুলনায় সত্তর আশি বৎসর কীই বা একটা বয়স? ঐ শহরগুলির যত দিন অস্তিত্ব ছিল, সেখানেই বার বার কত ছোট শিশুর জন্ম হয়েছে, তারা মরেছে! কিন্তু সেই দিনের সমৃদ্ধ বেবিলন, নিনেভার আজ সব লোপ পেয়ে শুধু নামটাই রয়েছে।

সিরিয়া প্রদেশে, ডামাস্কাস্ নামে আরেকটা প্রাচীন শহর ছিল। ডামাস্কাস্ কিন্তু আজও লোপ পেয়ে যায় নি। ডামাস্কাস্ আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর এটা এখনও একটা মস্ত শহর। কারো-কারোর মতে ডামাস্কাসই নাকি আজকাল পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর।

www.nagorikpathagar.org

ভারতবর্ষেও আমাদের বড় বড় শহরগুলি সবই নদীর তীরে। এদের মধ্যে দিল্লির কাছে ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল খুব প্রাচীন। ইন্দ্রপ্রস্থের অস্তিত্ব অবশ্য আজকাল লোপ পেয়ে গেছে। বারাণসী অথবা কাশী আরেকটি প্রাচীন শহর। পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরগুলির মধ্যে কাশী অন্যতম। এলাহাবাদ, কাণপুর, পাটনা এমনি আরও কতকগুলি, যা তোমার জানার মধ্যে, এরাও সব নদীর তীরে। এগুলি খুব প্রাচীন না হলেও এলাহাবাদ আর পাটনা যাদের আগে বলা হত প্রয়াগ ও পাটলিপুত্র, বেশ প্রাচীন।

চীন দেশেও এরকম কতকগুলি প্রাচীন শহর রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মিশর ও ক্রিট

প্রাচীনকালে এই সকল শহরে গ্রামে কেমন সব লোক বাস করতে তা জানবার কৌতূহলহল তোমার নিশ্চয়ই হচ্ছে। সেই সময়কার তৈরি বড় বড় দালান-কোঠা আর নানা রকমের স্থাপত্য নিদর্শন রেখে সেই যুগের কতকটা ধারণা করা যায়। সেই দিনের কতকগুলি প্রস্তরলিপিও রয়েছে, সেগুলি থেকেও অনেক কিছু জানা যায়। আবার কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিও আছে, সেগুলিও সেই যুগের ইতিহাসের মাল-মশলা।

মিশরের পিরামিড আর স্ফিংক্স (Sphinx)-এর কথা তো শুনেছ। লাকসার এবং অন্যান্য জায়গার বহু প্রাচীন কতকগুলি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কথাও তুমি জানো। এগুলি অবশ্য তুমি দেখ নাই, কিন্তু সুয়েজখালের ভিতর দিয়ে যাবার সময় এদের খুব কাছ দিয়েই আমরা গেছি। এদের ছবি তো তুমি দেখেছ, আর এগুলির ছবির পোস্টকার্ডও হয়তো তোমার কাছে আছে। স্ফিংক্স একটা বিরাট সিংহের প্রতিমূর্তি, এর মাথাটা কিন্তু একটি মেয়েমানুষের মুখ। এই বিরাট মূর্তিটা যে কেন তৈরি হয়েছিল আর কী যে এ বোঝাতে চায় তা কেউ বলতে পারে না। ঐ মেয়েমানুষটির মুখের ভিতর কিন্তু একটি অদ্ভুত মৃদু হাসির রেখা রয়েছে, লোকে ভেবে পায় না এ হাসির কী অর্থ। স্ফিংক্সের সাথে কাউকে তুলনা করলে বুঝবে তার কিছুই বোঝা গেল না।

পিরামিডগুলির গঠনও অতিকায়। এগুলি হল প্রাচীন মিশরের রাজাদের সমাধি-মন্দির। এই রাজাদের বলা হত ফেরো (Pharaoh)। লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যে মমি দেখেছ তোমার হয়তো মনে আছে। এই মমিগুলি হল কোনো পশু অথবা মানুষের মৃতদেহ, তৈল ও মশলা মেখে এদের এমন করে রাখা হয়েছে যে এগুলি আজও অবিকৃত রয়েছে, পচে নষ্ট হয়ে যায়নি। ফেরোদের (Pharaoh) মৃতদেহগুলি মমি করে পিরামিডের ভিতর রেখে দেওয়া হত, আর ঐ মমিগুলির কাছে নানা রকমের সোনারুপার গহনা, আসবাব, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদিও রেখে দেওয়া হত, কারণ মিশরিরা ভাবত, মৃত্যুর পরও তাদের ঐ সব জিনিসের প্রয়োজন হবে। কয়েক বৎসর আগে একটা পিরামিডের মধ্যে, কয়েকজন প্রত্নতাত্ত্বিক মিলে এক ফেরোর মমি আবিষ্কার করেছেন। এই রাজার নাম ছিল তুতানখামেন (Tutan-Khamen), এই মমিটির কাছে অনেক বহুমূল্য সুন্দর সুন্দর জিনিসও পাওয়া গেছে।

www.nagorikpathagar.org

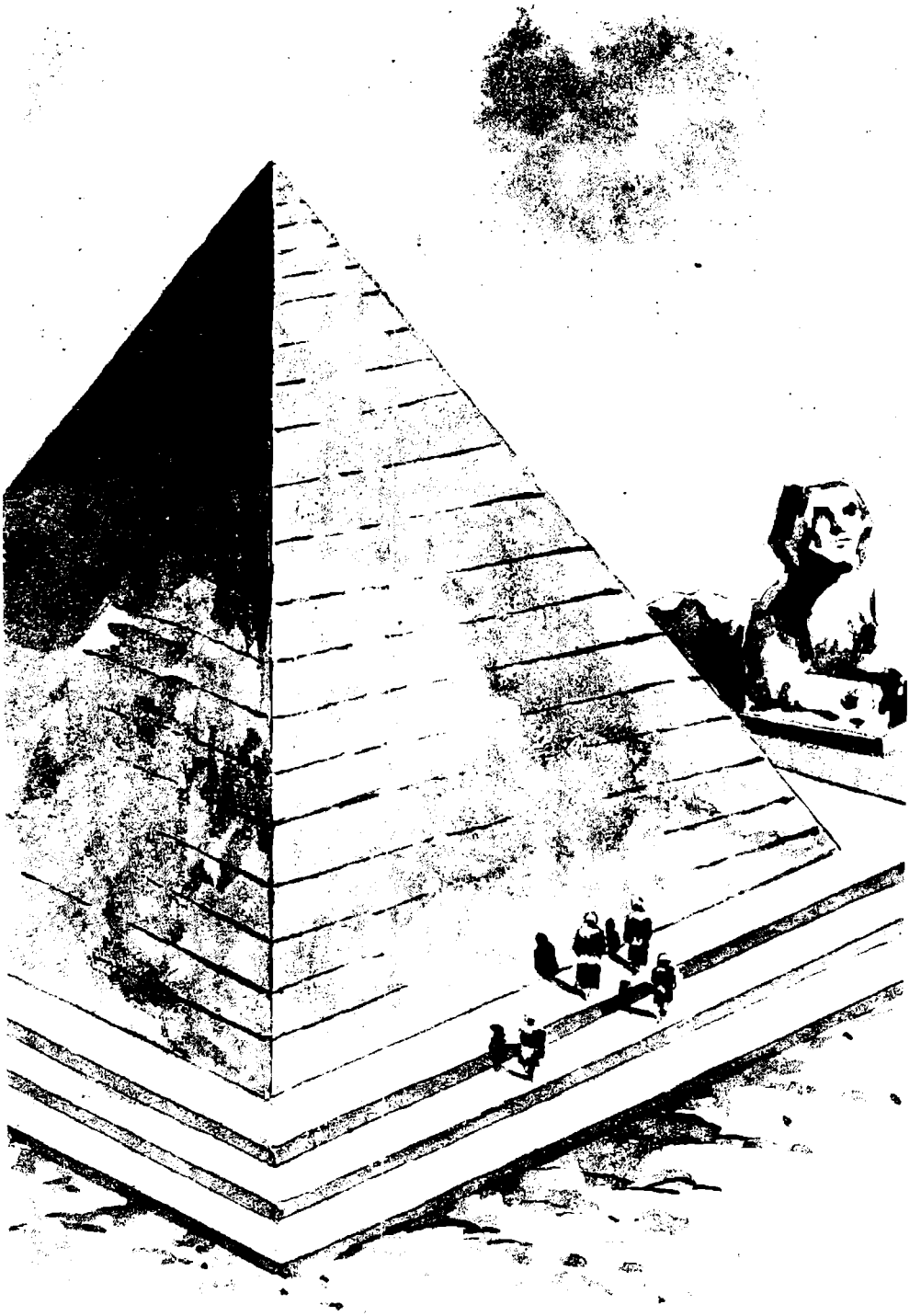

স্ফিংক্স ও পিরামিড

www.nagorikpathagar.org

সেই বহু প্রাচীন কালেও কিন্তু মিশরিরা কৃষি আর জলসেচনের সুবিধার জন্য সুন্দর সুন্দর হ্রদ ও বড়বড় খাল কেটেছিল। এই থেকেই বুঝবে প্রাচীন মিশরিরা জ্ঞানে বুদ্ধিতে কতদূর উন্নত ছিল। মেরিডুর (Meridu) মতো প্রসিদ্ধ হ্রদ ও বড় বড় খাল কাট্‌বার, পিরামিড তৈরি করবার, নিশ্চয়ই তাদের খুব ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ার ছিল।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ক্রিট অথবা কেনডিয়া (Candia) নামে ছোট্ট একটি দ্বীপ আছে। পোর্টসৈদ থেকে ভেনিসে যাবার পথে এর কাছ দিয়েই আমরা গেছি। বহুদিন আগে এই ছোট্ট দ্বীপটির মধ্যে একটা চমৎকার সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই ক্রিট দ্বীপের ক্নোসস্ (Knossoss) শহরে, বহু প্রাচীন একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও বর্তমান আছে। এই প্রাসাদের ভিতর আজকালকার দিনের মতো স্নানের ঘর, জলের কল এসবও রয়েছে। যারা জানেনা, তারা তো মনে করে এসব বুঝি আধুনিক যুগেরই আবিষ্কার। সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র, পাথরের মূর্তি, ছবি, ধাতু ও হাতির দাঁতের জিনিস ইত্যাদিও ঐ প্রাসাদে ছিল। এই নিরালা ছোট্ট দ্বীপটির মাঝে মানুষ বেশ শান্তিতে বাস করত আর উন্নতিও করেছিল খুব।

www.nagorikpathagar.org

রাজা মিডাস্ (Midas)-এর গল্প পড়েছ তো? সেই যে রাজা, যিনি যা কিছু ছুঁতেন তাই সোনা হয়ে যেত। বেচারা রাজা বড় বিপদেই পড়েছিলেন কিন্তু! কিচ্ছুটি খেতে পর্যন্ত পারতেন না—হায়রে, খাবারও যে সব ছুঁলেই সোনা হয়ে যায়। সোনা তো আর খাওয়া যায় না। লোভের জন্যই বেচারার এই শাস্তি হয়েছিল। গল্পটা অবশ্যি আগাগোড়া বানানো। এই গল্পে এই কথাটাই বোঝানো হয়েছে যে, সোনাকে মানুষ যতো মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় মনে করে আসলে তা নয়।

ক্রিট দেশের আর একটা গল্প আছে, সেটাও হয়তো তুমি পড়েছ। এই গল্পটা হল মিনোটার (Minotaur) সম্বন্ধে। এই মিনোটারটা ছিল একটা দৈত্য, অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক ষাঁড়। দৈত্যটার আহারের জন্য নাকি বালক-বালিকাদের এর কাছে বলি দেওয়া হত। তোমাকে আমি আগেই বলেছি, অজানার ভয়েই মানুষের মনে প্রথম ধর্মের চিন্তা এসেছিল। মানুষ প্রকৃতিকে বুঝত না, তার চারদিকে যেসব ঘটনা ঘটছে তার কারণও ছিল তার কাছে অজ্ঞাত, কাজেই ভয় পেয়ে নির্বোধের মতো অনেক কিছুই সে করে বসত। এ খুবই সম্ভব, ছেলেমেয়েগুলিকে একটা মনগড়া দৈত্যের কাছে বলি দেওয়া হত, কোনো সত্যিকার দৈত্যের কাছে নয়, কারণ, এ রকম কোনো দৈত্য ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি না।

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীনকালে পৃথিবী জুড়ে এরকম নরবলির একটা প্রথা বিদ্যমান ছিল। মনগড়া উপাস্য দেবতার নামে নরনারীদিগকে বলি দেওয়া হত। মিশর দেশে, মেয়েদের নীলনদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত, লোকে মনে করত তাদের 'পিতা-নীল' এতে তুষ্ট হবেন।

সুখের বিষয় পৃথিবীর অজানা কোণে দুএকটা দেশ ছাড়া নরবলির প্রথা আর এখন কোথাও নেই। কিন্তু এখনও কেহ কেহ ভগবানের তুষ্টির জন্য পশু বলি দেয়, একটা পশু বলি দিয়ে যে কেমন করে উপাস্য দেবতাকে তুষ্ট করা যায়, ভাবতে কিন্তু আমার ভারি অদ্ভুত ঠেকে।

www.nagorikpathagar.org

চীন ও ভারতবর্ষ

আমরা দেখেছি, মেসোপোটামিয়া, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের ছোট্ট ক্রিট দ্বীপে, প্রাচীন যুগে সভ্যতার বিকাশ ও উন্নতি হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে চীন এবং ভারতবর্ষেও দুইটি বিশাল সভ্যতার সূচনা হয় এবং নিজ নিজ ধারায় উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

অন্যান্য দেশের মতো চীন দেশেও বড় বড় নদীর উপত্যকা ভূমিতেই মানবের প্রথম বসবাস আরম্ভ হয়েছিল। এই মানুষদের আমরা বলি মোঙ্গলিয়ান। এরা প্রথম কাঁসার সুন্দর সুন্দর বাসন তৈরি করত, পরে লোহার ব্যবহারও এরা শিখেছিল। এরা খাল কাটত, বড় বড় বাড়ি নির্মাণ করত এবং লিখবারও একটা সুন্দর প্রণালী এরা আবিষ্কার করেছিল। এদের লেখার ধরণটা কিন্তু হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি অথবা উর্দুর চেয়ে একেবারে ভিন্ন ছিল। এ ছিল একরকমের ছবির লিখন। প্রত্যেকটি শব্দ, কখনও বা একটি ছোট বাক্যকেই ছবির দ্বারা প্রকাশ করা হত। প্রাচীন মিশর, ক্রিট, বেবিলনেও এরকম ছবির লেখার প্রচলন ছিল। এরকম লেখাকে আজকাল বলা হয় হিরোগ্লিফি (Hieroglyphy)। কোনো কোনো মিউজিয়ামে এবং বইতে এরকম ছবির লেখা তুমি দেখেছ। মিশরে এবং পশ্চিমের কোনো কোনো দেশে এরকমের লেখা, কেবল বহু প্রাচীন দালানের গায়েই দেখা যায়, বহুদিন ধরে ঐসব দেশে আর এই ধরনের লেখার প্রচলন নেই। চীন দেশের লেখাটা কিন্তু এখনও ছবি আঁকা। এই লেখার গতি, সাধারণ প্রচলিত নিয়মে বাঁ থেকে ডান দিকে নয়, উর্দুর মত ডান থেকে বা দিকেও নয়, এর গতি উপর থেকে নিচ দিকে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষগুলি আজও বেশির ভাগই মাটির নিচে ঢাকা রয়েছে। মাটি খুঁড়ে এগুলি বের না-করা পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষিগুলি আমাদের চোখের আড়ালেই থেকে যাবে। পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতিমধ্যে মাটির নিচে পাওয়া গেছে।

আর্যদের ভারতবর্ষে আগমনেরও বহু পূর্বে এ দেশে যে দ্রাবিড় জাতির বাস ছিল তা আমরা জানি। একটা চমৎকার সভ্যতা এরা গড়ে তুলেছিল। অন্যান্য দেশের সাথে তারা ব্যবসা বাণিজ্যও করত। মেসোপোটামিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে তারা তাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাত। সমুদ্রের পরপারে, সেগুন কাঠ, চাউল, আর মশলা (যেমন গোলমরিচ) রপ্তানি করা হত। কেউ কেউ বলেন মেসোপোটামিয়ার উর

www.nagorikpathagar.org

শহরের প্রাচীন প্রাসাদগুলি তৈরি করবার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে সেগুন কাঠের চালান দেওয়া হয়েছিল। সোনা, জহরৎ, হাতির দাঁত, ময়ূর, বানর এসব যে ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিম দেশে রপ্তানি হত তাও জানা যায়। কাজেই দেখ সেই প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসার আদানপ্রদান ছিল। সভ্য মানুষদের মধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন সম্ভব।

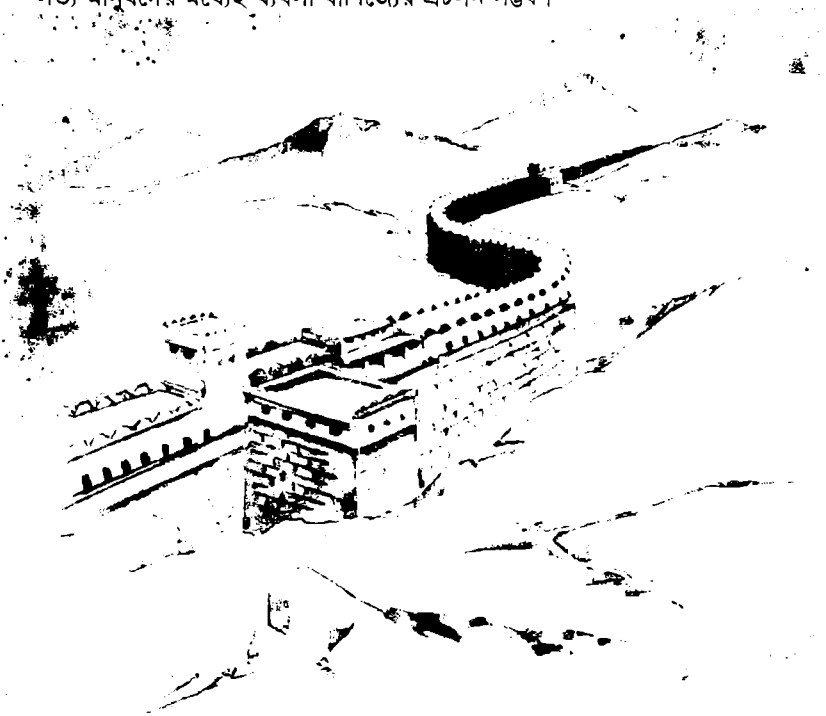

চিনের মহাপ্রাচীর

ভরতবর্ষ এবং চীন দুইটি দেশেই প্রাচীন যুগে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই দুইটি দেশের কোনোটিই কোনো সময়ে একজন শাসনকর্তার অধীনে ছিল না। প্রত্যেকটি নগর আর তার আশপাশের গ্রাম মাঠগুলি একটি শাসন নিয়মের অধীনে ছিল। এইগুলিকে আমরা বলি নাগরিক-রাষ্ট্র। সেই প্রাচীন কালেও কিন্তু এই সব নাগরিক-রাষ্ট্রের অনেক গুলিতেই গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। কোনো রাজা ছিল না, জনসাধারণের মনোনীত একজন পঞ্চায়েত শাসনকার্য চালাতেন। কোনো কোনো রাষ্ট্রের অবশ্য রাজাও ছিল। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নিজ নিজ শাসন নিয়ম থাকলেও, পরস্পরকে সাহায্য করবার রীতিও ছিল। অনেক সময় একটা বড় রাষ্ট্রকে কতকগুলি ছোট রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় বলে মেনে নেওয়া হত।

www.nagorikpathagar.org

চীন দেশে ক্রমে ক্রমে এই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলিই সংঘবদ্ধ হয়ে একটা বড় রাষ্ট্র অথবা মহারাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। চীনের মহারাজ্য যখন স্থাপিত হয়, তখনই চীনের মহাপ্রাচীরও তৈরি হয়েছিল। এই প্রাচীরের কথা তুমি পড়েছ, এর বিশালতার কথাও তুমি জানো। অন্যান্য মোঙ্গল জাতিরা যাতে চীন রাজ্য আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যই এই প্রাচীর সমুদ্র থেকে আরম্ভ করে উত্তর দিকের বড় বড় পাহাড়গুলি পর্যন্ত গেথে নেওয়া হয়েছিল। এই বিশাল প্রাচীর ১৪০০ মাইল লম্বা, ২০ থেকে ৩০ ফিট পর্যন্ত উঁচু, আর ২৫ ফিট চওড়া। প্রাচীরের মাঝে মাঝে দুর্গ আর গম্বুজ আছে। ভারতবর্ষে এ রকম একটা প্রাচীর তৈরি হলে, সেটা লম্বা হত উত্তরে লাহোর থেকে দক্ষিণে মাদ্রাজ পর্যন্ত। এই মহাপ্রাচীর বহু দিন ধরে আজও দাঁড়িয়ে আছে, চীন দেশে গেলে দেখবে।

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রা

ফিনিশিয়ান্‌রা প্রাচীন যুগের আরেকটি বিশিষ্ট জাতি। ইহুদি, আরব আর ফিনিশিয়ান্‌রা একই জাতি। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে (বর্তমান তুরস্ক) এদের বাস ছিল। তাদের প্রধান নগরগুলির নাম ছিল, একার টায়র, সাইডন; এগুলি ভূমধ্যসাগরের কূলে অবস্থিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বহু দূর দেশে সমুদ্রযাত্রা ছিল এদের বৈশিষ্ট্য। ভূমধ্যসাগরের সমস্তটাতেই তাদের যাতায়াত ছিল, সমুদ্র পথে ইংল্যান্ড পর্যন্তও এরা যেত। কে জানে, ভারতবর্ষেও হয়তো আসত।

এবার সমুদ্রযাত্রা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, এ দুটা ঘটনার বিস্ময়কর সূচনার কথায় এসে পড়েছি। প্রত্যেকটাই আরেকটার উন্নতির সহায়ক হয়েছিল। আজকের দিনের মতো সুন্দর সুন্দর জাহাজ স্টিমার কিন্তু সেদিনে ছিল না। একটা গাছের গুঁড়িকে গর্ত করেই হয়তো প্রথম নৌকা তৈরি হয়েছিল। সাথে দাঁড় ব্যবহার করা হত, আর সময় সময় বাতাসের ভরে পাল তুলে দেওয়া হত। সেদিনের সমুদ্রযাত্রা ছিল নিশ্চয়ই খুব বিস্ময়কর, চমকপ্রদ। একখানা ছোট্ট নৌকা, দাঁড় আর পাল, এই নিয়ে তুমি আরব সাগর পাড়ি দিচ্ছ—ভাবতে কেমন লাগে? নড়বার-চড়বার বেশি জায়গা নেই, আর অল্প একটু বাতাস উঠলেই নাগরদোলা খেতে খেতে একেবারে সমুদ্রের নিচে টুপ। খুব সাহসী লোক ছাড়া সমুদ্রের বুকে এমন করে যেতে কে সাহস করে বল? বিপদেরও সীমা ছিল না, মাসের পর মাস হয়তো তীরের নাগালই পাওয়া যেত না। খাবার টান পড়লে, সেই মাঝ দরিয়ায়, মাছ ধরতে অথবা দুএকটা পাখি শিকার করতে না পারলে আর খাবার জোগাড় করবার কোনো উপায়ই ছিল না। সমুদ্র ছিল সেদিন বিপদ বাধায় পূর্ণ, রহস্যে ঘেরা। সেদিনের নাবিকদের বহু গল্প, সমুদ্রের বহু অদ্ভুত ঘটনার কথা আজও মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে।

এত বিপদ ঘাড়ে করেও কিন্তু মানুষ সেদিনে সমুদ্র পাড়ি দিত। কেউ কেউ হয়তো অজানা বিপদের সম্মুখীন হতে ভালোবাসত বলেই সমুদ্রযাত্রা করত, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সোনা আর ধনের লোভে এ কাজ করত। তারা ব্যবসা করত, বিভিন্ন দেশে জিনিস কেনা বেচা করতে, সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। এমনি করে ব্যবসা দ্বারা তারা ধন উপার্জন করত।

আচ্ছা, ব্যবসা কী, আর কেমন করেই বা এর আরম্ভ হল? চারদিকেই তো এখন বড় বড় দোকান রয়েছে, তোমার দরকার হলেই চট্ করে একটা দোকানে ঢুকে তোমার ইচ্ছামতো জিনিস কিনে আনতে পার। কিন্তু, এই যে তুমি একটা জিনিস

www.nagorikpathagar.org

কিনে এনেছ এ আসলো কোথা থেকে, কখনো ভেবে দেখেছ? এলাহাবাদের একটা দোকান থেকে তো একখানা উলের শাল কিনে আনলে, কিন্তু ভেবে দেখ, এই শালখানা হয়তো সেই কাশ্মির থেকে এতটা পথ এসেছে, আর এর পশমগুলি হয়তো জন্মেছিল, কাশ্মির অথবা লাদাক্ পাহাড়ের ভেড়ার গায়। যে টুথপেস্টটা কিনে এনেছ, তা-ও হয়তো জাহাজ আর রেলে চড়ে আমেরিকা থেকে এসেছে। আবার চীন, জাপান, প্যারি অথবা লন্ডনের তৈরি জিনিসও হয়তো তুমি কিনতে পার। আচ্ছা, একখানা বিলাতি কাপড়ের কথাই ধরা যাক, যা এখানকার বাজারে বিক্রি হয়েছে। এর তুলাটা জন্মেছিল ভারতবর্ষে, সেটাকে পাঠানো হল ইংল্যান্ডে, সেখানে একটা বড় ফ্যাক্টরি তুলাটাকে কিনে নিল, পরিষ্কার করল, সূতা তৈরি করল, তারপর তার থেকে কাপড় তৈরি হল। এই কাপড়খানাই শেষে ঘুরে এসে ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রি হল। কাপড়খানা বিক্রি হবার আগে, আগু পিছু করে অনেক হাজার মাইল ঘুরে এল। এটা তোমার কাছে নিশ্চয়ই ভারি বোকামি মনে হবে যে, যে তুলাটা ভারতবর্ষে জন্মেছিল, সেটাই কাপড় তৈরি হবার জন্য গেল ইংল্যান্ডে, তারপর আবার ফিরে এল ভারতবর্ষে। কতটা সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় হল ভেবে দেখ তো! তুলাটাকে যদি ভারতবর্ষেই কাপড় তৈরি করা যেত, তবে অনেক শস্তাও হত ভালোও হত। জানইত আমরা বিদেশি কাপড় কিনিও না পরিও না। আমরা খদ্দর পরি, কারণ, যতটা সম্ভব আমাদের স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। খদ্দর আমাদের এই কারণেও পরা উচিত যে, যেসব গরিব লোকেরা সূতা কাটে, কাপড় বোনে, তাদেরও এতে সাহায্য করা হবে।

কাজেই দেখ, আজকাল ব্যবসা জিনিসটার বড় ঘোরপ্যাঁচ। বড় বড় জাহাজগুলি অনবরত এক দেশের জিনিস নিয়ে আরেক দেশে যাওয়াআসা করছে। প্রথম থেকেই অবশ্য ব্যবসার এই রীতি ছিল না।

একেবারে প্রথম অবস্থায়, মানুষ যখন সবে মাত্র বসবাস শুরু করেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বলে তখন বড় একটা কিছু ছিল না। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসই যার যার নিজের জোগাড় করে, নয়তো নিজের হাতে তৈরি করে নিতে হত। তার পরের অবস্থাটা তো তোমাকে এর আগেই বলেছি—মানুষের সমাজে কর্মবিভাগ আরম্ভ হল; প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন কাজ ছিল, আর প্রত্যেক জিনিস তৈরি করবারও ভিন্ন ভিন্ন লোক ছিল। কখনো কখনো হয়তো এমন হয়েছে যে দুইটি দলের কাছে দুইটি ভিন্ন জিনিস বেশি পরিমাণে জমা হল। তখন নিজেদের সুবিধার জন্য তারা জিনিসের অদলবদল করে নিত। যেমন ধর, একটা গরুর বদলে একটি দল, আর একটি দলের কাছ থেকে এক ছালা শস্য নিয়ে নিল। টাকাপয়সা তো আর সেদিনে ছিল না, কাজেই কেবল জিনিসের বিনিময়ই চলত। এরকম করেই দ্রব্য বিনিময় আরম্ভ হল। এটা অবশ্য খুবই অসুবিধার ব্যাপার ছিল। এক ছালা শস্য অথবা এমনি কোনো একটা জিনিসের প্রয়োজন হলে মানুষকে একটা গরু অথবা এক জোড়া ভেড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হত। কিন্তু তা হলেও আস্তে আস্তে এই ভাবেই ব্যবসার প্রসার হতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

যখন সোনারুপার আবিষ্কার হল তখন ব্যবসার জন্য ঐসব ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হল। যার মাথায় ধাতু বিনিময়ের বুদ্ধিটা প্রথম এসেছিল, সে নিশ্চয়ই খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল। ব্যবসাক্ষেত্রে সোনারুপার ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় ব্যবসার রীতিটাও অনেক সহজ হল। তখন পর্যন্তও কিন্তু আজকের মতো মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয় নাই। সোনাটাকে ওজন করে আরেক জনকে দেওয়া হত। এর অনেক পরে মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হল। এতে ব্যবসার পথও অনেক সহজ হল। ওজন করবার প্রয়োজন ছিলনা, কারণ, প্রত্যেক মুদ্রার মূল্যই সকলের জানা ছিল। আজকাল মুদ্রার ব্যবহার সব দেশেই আছে। কিন্তু মনে রেখ, টাকা পয়সার অমনি কোনো মূল্য নেই। আমাদের দরকারি জিনিসগুলি কিনবার সুবিধা হয় বলেই টাকা পয়সার যা মূল্য, এরা দ্রব্য বিনিময়ের সাহায্য করে। রাজা মিডাসের কথা মনে আছে তো? বেচারার সোনার অভাব ছিল না, তবু খাওয়া জুটত না! কাজেই দেখ, আমাদের দরকারি জিনিস কিনবার সুবিধা ছাড়া টাকা পয়সার আর কোনো মূল্য নেই।

অনেক গ্রামেই দেখবে আজ পর্যন্তও দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা রয়ে গেছে, সেখানে টাকা পয়সার বালাই নেই। সুবিধার জন্যই টাকাপয়সার ব্যবহার হয়। এমন বোকা লোকেরও অবশ্য অভাব নেই, যারা মনে করে টাকাটারই যথেষ্ট মূল্য, কাজেই তারা যা কিছু উপার্জন করে, তাই সঞ্চয় করে, টাকার সদ্ব্যবহার তারা জানেনা। এর মানে, ওরা জানেনা টাকাপয়সার ব্যবহার কেমন করে আরম্ভ হল, আর এই টাকা পয়সার আসল মূল্যই বা কী।

www.nagorikpathagar.org

ভাষা, লিপি ও সংখ্যাপ্রণালী

বিভিন্ন ভাষা আর তাদের সম্পর্কের কথাটা এর আগেই বলেছি। ভাষার সৃষ্টি হল কেমন করে সেই কথাটাই এখন বলব।

দেখা যায়, কোনো কোনো জাতের পশুর মধ্যেও একরকমের কথাবার্তার প্রচলন আছে। বানরদের মধ্যে তো নাকি কয়েকটা সাধারণ জিনিস বোঝাবার জন্য কয়েক রকমের চিৎকার অর্থাৎ কয়েকটা শব্দের ব্যবহার আছে। তুমি হয়তো লক্ষ করেছ, কোনো কোনো পশু ভয় পেয়ে তাদের জাতের অন্যান্যদের সতর্ক করবার জন্য একরকমের অদ্ভুত চিৎকার করে।

মানুষের মধ্যেও হয়তো প্রথম ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল এমনি করেই। প্রথম অবস্থায়, খুব সম্ভব, ভয় এবং সতর্কতা প্রকাশের জন্য কয়েকটা বিশেষ রকমের চিৎকার করা হত। তারপর হয়তো আর একরকম আওয়াজের উদ্ভাবন হল, যাকে বলা যায় 'শ্রম-রব'। যখন কতকগুলি লোক এক সঙ্গে কোনো কাজ করে, তাদের সমস্বরে একটা চিৎকার করতে শুনা যায়। কোন কিছু একসঙ্গে টানাটানি অথবা একটা ভারী জিনিস তোলবার সময় সকলে মিলে সমস্বরে যে একটা রব তোলে তা তুমি হয়তো শুনেছ। মনে হয়, সবাই মিলে এইরকম ঐক্যরব করে, যেন তারা নিজেদের মধ্যে একটু জোর পায়। এই রকমের 'শ্রমরব'ই হয়তো মানুষের ব্যবহৃত আদিম শব্দ।

তারপর ক্রমে ক্রমে ছোট ছোট আরও সব শব্দের সৃষ্টি হল, যেমন—জল, আগুন, ঘোড়া, শূয়র। এইগুলি বোঝাবার জন্য তারা যে কী শব্দ প্রথম ব্যবহার করত তা অবশ্য এখন আর আমাদের জানা নেই। প্রথম অবস্থায় হয়তো কেবল নামবাচক শব্দেরই ব্যবহার ছিল, ক্রিয়াবাচক শব্দ ছিল না। ধর, কেহ যদি বোঝাতে চাইত সে একটা শূয়র দেখেছে, সে করত কী জানো?—'শূয়র' এই বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত—শিশুদের মতো আর কী! সেই দিনে কথাবার্তা কারোর সাথে কারোর বড় একটা নিশ্চয়ই হত না।

তারপর ধীরে ধীরে ভাষার পরিণতি আরম্ভ হল। প্রথম ছোট ছোট বাক্য, তারপর আর একটু বড়, এরকম ভাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে মাত্র একটা ভাষা হয়তো কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু এমন একসময় নিশ্চয়ই ছিল, যখন

www.nagorikpathagar.org

অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষা ছিলনা, প্রত্যেকটার থেকেই ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি করে উপভাষার সৃষ্টি হয়েছে।

এখন যে সময়কার প্রাচীন সভ্যতার কথা বলছি, সেই সময়ের মধ্যে ভাষার অনেক উন্নতি হয়েছে। অনেক গানের রচনা হয়েছিল, আর সেগুলি চারণ আর গায়কেরা গেয়ে গেয়ে বেড়াত। লেখার অথবা বইয়ের প্রচলন অবশ্য তখনও খুব হয় নাই, কাজেই মানুষকে সেদিনে অনেক কিছুই মনে করে রাখতে হত। ছড়া আর পদ্য মনে রাখা অনেক সহজ; কাজেই প্রাচীন-যুগের সব সভ্য দেশেই ছড়া ও গাঁথার খুব প্রচলন ছিল।

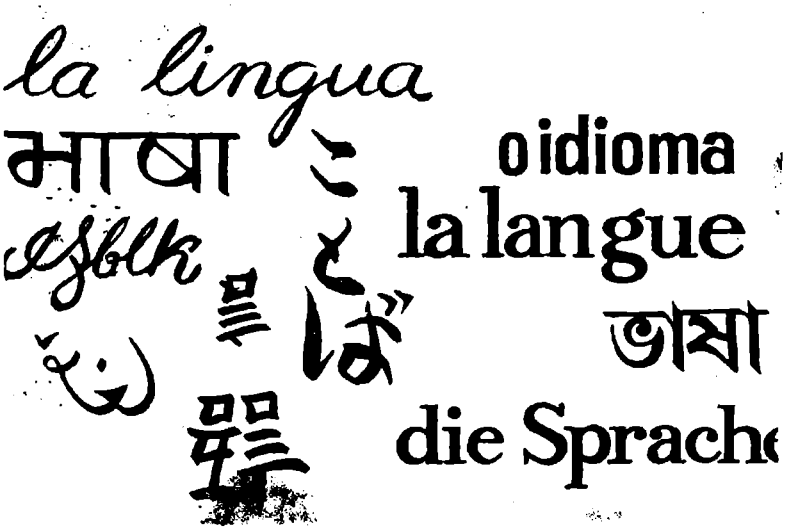

গায়ক অথবা চারণেরা মৃত বীর পুরুষদের গৌরবগাঁথা গাইতে খুব ভালোবাসত। সেদিনের মানুষ ছিল খুব যুদ্ধপ্রিয়, কাজেই গানগুলিও ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব-কাহিনী। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সব সভ্য দেশেই এই গান আর গাঁথাগুলি খুব লোকপ্রিয় ছিল।

লেখার আরম্ভটা শুনতেও তোমার খুব ভালো লাগবে। চীন দেশের লেখার কথা আগেই বলেছি। সব লেখাই হয়তো প্রথম ছবি দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল। ধর, কেউ যদি ময়ূর সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইত, সে হয়তো একটা ময়ূরের ছবি এঁকে তাই বোঝাতে চেষ্টা করত। অবশ্য এরকম ভাবে আর অনেক কথা লেখা সম্ভব নয়। এই ছবিগুলিই ক্রমে ক্রমে সংক্ষিপ্ত হতে লাগল, আর তার থেকেই বহু পরে বর্ণমালার কথা কেউ ভেবে আবিষ্কার করেছিল। সেই থেকেই লেখাটাও খুব সহজ হয়ে গেল আর ভাষারও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যাপ্রণালী এবং গণনা মানুষের আরেকটা মস্ত আবিষ্কার। সংখ্যা ছাড়া যে কেমন করে ব্যবসা চলতে পারে ভাবা যায় না। এই সংখ্যার আবিষ্কার যিনি প্রথম করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই একজন মস্ত প্রতিভাবান ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। ইউরোপে সংখ্যাগুলি প্রথমে বড়ই হিজিবিজি ছিল। রোমান সংখ্যার কথা জানো তো? এদের এমনি লেখা হয়—I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X ইত্যাদি। বড্ড হিজিবিজি, এদের ব্যবহার মোটেই সহজ নয়। আজকাল সব ভাষাতেই আরবি প্রণালীর সংখ্যা ব্যবহৃত হয়, এই প্রণালীটা অনেক সহজ—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০।

ইউরোপের লোকেরা আরবদের কাছ থেকে এই প্রণালীটা শিখেছিল, তাই তারা এর নাম দিয়েছে আরবি। আরবেরা নিজেরা কিন্তু এই প্রণালীটা ভারতবর্ষের কাছ থেকে শিখেছিল, কাজেই সত্যি বলতে একে ভারতীয় বলাই উচিত।

কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি দৌড়ুচ্ছি। আরবদের কথা তোমাকে এখনও কিছু বলা হয় নাই।

www.nagorikpathagar.org

সমাজে শ্রেণীবিভাগ

ছোট ছেলেমেয়েদের তো বটেই, বড়দেরও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় এক অদ্ভুত রীতিতে। রাজাদের নামধাম, যুদ্ধ ইত্যাদির সন তারিখ এসবই কেবল শেখানো হয়। কিন্তু মনে রেখ, ইতিহাস কেবল কয়েকটি যুদ্ধ আর কয়েকজন রাজা, সেনাপতির কথাই নয়। ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, একটা দেশের ও একটা জাতির কথা, তাদের জীবনধারণের রীতির কথা, তাদের কর্মধারা ও তাদের চিন্তাধারার কথা। ইতিহাস আমাদের বলে দেয়, একটা জাতির সুখদুঃখের কথা, তাদের বাধাবিপত্তির কথা, আর সেই বাধাবিপত্তি তারা কেমন করে জয় করেছিল তারই কথা। এ রকম ভাবে ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারব। আমরা যদি ঐ একই রকমের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হই, ইতিহাসের শিক্ষা আমাদিগকে বলে দেবে কেমন করে তাকে জয় করা যায়। বিশেষত অতীত দিনের ইতিহাস আলোচনা করেই আমরা বুঝতে পারি, কোনো একটা জাতি ভালোর দিকে যাচ্ছে কী মন্দের দিকে; উন্নতির দিকে যাচ্ছে, কী অবনতির দিকে।

অবশ্য অতীত কালের প্রসিদ্ধ নরনারীদের জীবনী থেকে আমাদের যা শিখবার আছে তা শিখতে হবে, কিন্তু অতীতকালে বিভিন্ন জাতির অবস্থা কেমন ছিল তা-ও আমাদের জানতে হবে।

তোমাকে তো অনেকগুলি চিঠি লিখেছি, এইখানা নিয়ে চব্বিশখানা। কিন্তু এই পর্যন্ত, সেই অতীতকালের কথাই বলেছি, যার কথা আমরা বিশেষ কিছু জানিনা। এই সব কাহিনীকে আর সত্যিকার ইতিহাস বলা চলেনা। এগুলিকে হয়তো বলা চলে ইতিহাসের সূচনা, অথবা ইতিহাসের ঊষাকাল। এর পরে যে যুগের কথা বলব, তার বিষয় আমরা অনেক কিছু জানি, ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করাও তার চলে। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতার কথা শেষ করবার আগে, আরেক বার সেই যুগে একটু উঁকি মেরে, সেই দিনে কীরকম সব বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল তাই দেখে নিই।

আমরা আগেই দেখেছি, কোনো এক সময় প্রাচীন যুগের দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কর্ম করতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ কর্মবিভাগের সূচনা হল। আমরা আরো দেখেছি, দলের কর্তা আর তার পরিবার, দলের অন্যান্যদের চেয়ে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল। দলপতি নিজের হাতে কেবল দল পরিচালনার ভারটাই রাখল। সে আর তার পরিবারের লোকেরা উচুদরের, অর্থাৎ ভিন্ন আরেক শ্রেণীর লোক হয়ে দাঁড়াল। এমনি করেই দেখ, মানুষের সমাজে দুইটি শ্রেণীর সৃষ্টি হল; এক শ্রেণীর

www.nagorikpathagar.org

কাজ ছিল, —আদেশ করা ও কর্ম পরিচালনা করা; আর অন্য শ্রেণীর কাজ ছিল,— শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করা। অবশ্য যে-শ্রেণীর লোকদের হাতে পরিচালনার ভার ছিল, তাদের ক্ষমতাও বেশি, আর এই ক্ষমতার জোরেই তারা যতটা সম্ভব জিনিসের বড় ভাগটাই গ্রহণ করত। শ্রমিকদের কাছ থেকে বড় ভাগটা গ্রহণ করেই তারা হল ধনী।

আবার সমাজে কর্মবিভাগ যতই প্রসার পেতে লাগল; সাথে সাথে আরো কতকগুলি শ্রেণীরও উদ্ভব হল। প্রথমেই ধর, রাজা তার পরিবার আর পরিষদের দল। দেশ শাসন আর যুদ্ধের কাজ এরাই করত। এ ছাড়া তারা আর বড় বেশি কিছু করত না।

তারপর, মন্দিরের সব পুরুত আর আনুষঙ্গিক কর্মচারীগোষ্ঠী হল আরেক শ্রেণী। এই পুরুতেরা দেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছিল, তাদের বিষয় পরে আরো বলব।

তৃতীয় আরেকটি শ্রেণী হল সওদাগর। এরা ব্যবসার জন্য এক দেশের দ্রব্যাদি অন্য দেশে নিয়ে যেত, দোকান খুলে কেনাবেচার কাজ করত।

চতুর্থ আরেকটি শ্রেণী হল কারিগর, এরা মানুষের প্রয়োজনীয় সব রকমের জিনিস তৈরি করত। তাদের কেউ সূতা কাটত, কেউ কাপড় বুনত, কেউ মাটির জিনিস তৈরি করত আর কেউবা কাঁসার বাসন তৈরি করত; সোনার কাজ, হাতির দাঁতের কাজ আর এমনি সব অন্যান্য হস্তশিল্পের কাজও আবার কেউ কেউ করত। এদের বেশিরভাগই শহরে অথবা তার আশপাশে বাস করত, কেউ কেউ গ্রামেও বাস করত।

সর্বশেষ, আরেকটি শ্রেণী হল কৃষক ও মজুর। কৃষকেরা মাঠে কাজ করত, আর মজুরেরা যেত শহরে। এই কৃষক ও মজুরের শ্রেণীই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর কাছ থেকে এরা কখনো উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেত না, সবাই চাইত এই বেচারাদের শোষণ করতে।

www.nagorikpathagar.org

রাজা পুরোহিত ও মন্দির

আমার আগের চিঠিতে পাঁচটি বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলেছি। কৃষক এবং মজুর শ্রেণীর লোকেরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। কৃষকেরা লাঙল দিয়ে মাটি চাষ করে শস্য উৎপাদন করত। কৃষকেরা যদি কৃষির কাজ না করত, আর অন্যান্য লোকেরাও যদি কেউই মাঠের কাজ না করত, তবে আর সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের নিশ্চিন্ত মনে ভরপেটের আহার জোটানো সম্ভব হত না। কাজেই কৃষকেরা ছিল সমাজের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এরা না হলে সবাইকে উপোশ করেই মরতে হত। মজুরেরাও মাঠে এবং শহরে অনেক প্রয়োজনীয় কাজ করত। মানুষের মুখের আহার যোগান দিতে এই কৃষক ও মজুর শ্রেণী, সমাজের পক্ষেও প্রয়োজনীয় ছিল এরাই সবচেয়ে বেশি; কিন্তু তারা যা কিছু উৎপাদন করত তার বেশির ভাগটাই যেত অন্যের হাতে, বিশেষ করে রাজা আর তারই সমশ্রেণীর অভিজাতদের হাতে।

আমরা দেখেছি, রাজা এবং তার শ্রেণীর লোকদের হাতে খুব বেশি ক্ষমতা ছিল। দলসৃষ্টির প্রথম অবস্থায় জমির মালিক ছিল সমস্ত দলটি, জমি কারুর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু রাজসম্প্রদায়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা বলতে আরম্ভ করল, জমির মালিকও তারাই। তারা হয়ে গেল জমিদার; আর কৃষকশ্রেণী, যারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে জমির কাজ করত, তারা হয়ে গেল, বলতে গেলে, জমিদারদের ভৃত্য। কৃষক জমি থেকে যা-কিছু উৎপাদন করত তারই ভাগ হত, বড় ভাগটা অবশ্য যেত জমিদারে দিকে।

কোনো কোনো মন্দিরেরও আবার জমি ছিল, আর পুরুতেরা ছিল জমিদার।

এখন মন্দির আর মন্দিরের পুরুতদের কথা তোমাকে বলব। তোমাকে এর আগে একখানা চিঠিতে লিখেছি, আদিম যুগের মানুষেরা অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার কারণই ঠিক ঠিক বুঝতে না পেরে ভয় পেত; এই ভয় থেকেই ঈশ্বর আর ধর্মের চিন্তা মানুষের মনে প্রথম এসেছিল। নদী, পাহাড়, সূর্য, গাছ, পশু এদের সব কিছুকেই তারা দেবদেবী বলে মনে করত, কতকগুলি ছিল আবার অদৃশ্য মনগড়া ভূত! ভয় তাদের মনে লেগেই ছিল, কাজেই তারা মনে করত দেবতা বুঝি তাদের শাস্তি দেবার জন্যই সব সময় ব্যস্ত। তারা ভাবত দেবতা বুঝি তাদেরই মতো কর্কশ আর নিষ্ঠুর; কাজেই, একটা পশু, পাখি অথবা মানুষ বলি দিয়ে, তারা চাইত দেবতাকে খুশি রাখতে।

www.nagorikpathagar.org

এই দেবতাদের পূজার জন্য ক্রমে ক্রমে মন্দির গড়ে উঠতে লাগল। মন্দিরের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান ছিল যাকে বলা হত 'পূজাঘর'; সেখানে তাদের আরাধ্য দেবতার মূর্তি থাকত। চোখের সামনে কিছু না দেখে আর কেমন করে পূজা করবে? সেটা কঠিন। একটি ছোট শিশু তো কেবল যা দেখে তার বিষয়ই চিন্তা করতে পারে। এই আদিম মানুষেরাও তো শিশুদের মতোই ছিল। কোনো মূর্তি না-দেখে তাদের পক্ষে পূজা করা সম্ভব ছিল না, কাজেই মন্দিরে দেবতার মূর্তি স্থাপন করত। কিন্তু ভারি আশ্চর্য, মূর্তিগুলি প্রায়ই ছিল ভয়ংকর আর বিশ্রী। কোনো কোনোটি ছিল পশুর মতো, আবার কোনো কোনোটি ছিল অর্ধেক পশু অর্ধেক মানুষ। মিশর দেশে একসময় এরা একটা বিড়ালের মূর্তি, আর একসময় একটা বানরের মূর্তি পূজা করা হত। মানুষ যে একরকম সব বিকট আকৃতির পশুর পূজা কেন আরম্ভ করেছিল, বোঝা মুস্কিল। যে মূর্তি পূজা করা হবে তাকে তো সুশ্রী সুন্দর করে তৈরি করলেই হয়। কিন্তু হয়তো, তাদের ধারণা ছিল, দেবতারা তো ভয়ের জিনিস, কাজেই তাদের মূর্তিও হওয়া চাই সব ভয়ংকর আকারের।

আজকাল বেশির ভাগ মানুষেরই ধারণা এক ঈশ্বর, এক পরমশক্তি, কিন্তু সেই দিনের লোকের হয়তো ঈশ্বর সম্বন্ধে এই রকম ধারণা ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, অনেকগুলি দেবদেবী রয়েছে আর মাঝে মাঝে তারা ঝগড়াঝাঁটিও করে। ভিন্নভিন্ন নগর আর ভিন্নভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেবতার পূজা হত।

মন্দিরগুলি স্ত্রী পুরুষ দুই রকমের পুরুতেই ভরা ছিল। লেখাপড়া এই শ্রেণীর লোকেরাই বেশি জানত, কাজেই অন্যদের চেয়ে তারাই ছিল বেশি জ্ঞানী। এরাই রাজাদের মন্ত্রী হত। সেসব দিনে পুরুতেরাই বই লিখতেন আর বই নকল করতেন। তাঁদের বিদ্যা ছিল, কাজেই এই পুরুতেরাই ছিল প্রাচীন যুগের জ্ঞানীসম্প্রদায়। চিকিৎসক ও তাঁরাই ছিলেন। তাঁরা যে কতবড় জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান তাই দেখবার জন্য আবার মাঝে মাঝে সাধারণ লোকদের কয়েকটা চাতুরী দেখিয়ে ভক্তি আকর্ষণ করতেন। সাধারণ লোকেরা তো ছিল শাদাসিধা সরল প্রকৃতির; কাজেই পুরুতদের এরা মনে করত যাদুকর, আর তাদের ভয়ও করত খুব।

পুরুতেরা সাধারণ লোকদের জীবনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। সমাজে তাঁরাই ছিলেন জ্ঞানীসম্প্রদায়, কাজেই বিপদে পড়লে, ব্যারাম হলে সকলেই তাঁদের কাছে যেত। সাধারণের জন্য বড় বড় উৎসবের অনুষ্ঠান এরা করতেন। সেই দিনে, সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোনো পঞ্জিকা ছিল না। এই সব উৎসবের দ্বারাই তাদের দিন গুণতি হত।

পুরুতেরা যদিও অনেক সময়েই সাধারণ লোকদের ঠকিয়ে ভুল পথে নিয়ে যেত, কিন্তু আবার এদের সাহায্যও করত, উন্নতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টাও করত।

মানুষ যখন শহর গড়ে প্রথম বসবাস শুরু করেছিল, কোনো কোনো দেশের শাসনের কাজটা রাজার দ্বারা না হয়ে পুরুতের দ্বারাই হত। তারপর, রাজা ক্রমে পুরুতের ক্ষমতা অধিকার করল, কারণ, যুদ্ধ করতে রাজাই ছিল বেশি পটু। কোনো কোনো দেশে রাজা আর পুরুত ছিল একই ব্যক্তি, যেমন মিশরের ফেরোরা। ফেরোদের জীবিত অবস্থায় মিশরিরা এদের মনে করত নরদেবতা। আর যখন মরে যেত তখন তো দেবতা বলেই তাদের পূজা করা হত।

www.nagorikpathagar.org

কথা কও কথা কও অনাদি অতীত

আমার চিঠি পড়তে এবার তোমার নিশ্চয়ই বিরক্তি ধরে গেছে। এখন তোমার একটু বিশ্রামের দরকার, কয়েকদিন তোমাকে আর নূতন কিছু লিখব না। এতদিনে যা যা লিখেছি, সেটাই আরেকবার ভেবে দেখ। লক্ষ লক্ষ বৎসরের কাহিনী তো তোমাকে কয়েকখানা চিঠির পাতায় শেষ করে দিয়েছি। পৃথিবীটা যেদিন সূর্যর একটুখানি অংশ ছিল, সেদিন থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীটা সূর্যের গা থেকে কেমন করে আগলা হয়ে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে লাগল, সে কথা বলেছি। আবার পৃথিবীর গা থেকে চন্দ্রটাও একদিন আলগা হয়ে গেল। বহুযুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে প্রাণের চিহ্ন ছিল না। তারপর, কত লক্ষ—কত কোটি বর্ষ ধরে ধীরে ধীরে জীব সৃষ্টি হতে লাগল। লক্ষ—কোটি বর্ষ! ধারণা হয় তোমার? এর ধারণা করা খুবই কঠিন। তোমার বয়স তো সবে এই দশবছর, কিন্তু এর মধ্যেই কত বড় হয়ে গেছ! বাস্‌রে একেবারে 'ইয়ং লেডি' (Young lady)! একশো বৎসর তো তোমার কাছে অনেক কাল—তারপর হাজার বৎসর—তারপর হাজারের একশো গুণ হল লক্ষ, তারপর লক্ষের একশো গুণ হল কোটি। থাক, তোমার ছোট্ট মাথায় হয়তো ভালো করে ঢুকছে না।

নিজেদের তো আমরা মনে করি মস্ত কেউকেটা, ছোট জিনিসের ওপর আমাদের কত ঘৃণা, তার কথা শুনতে আমাদের ভালই লাগে না। কিন্তু পৃথিবীর অনন্ত কালের ইতিহাসের মধ্যে আমাদের ছোটখাট জীবনের ঘটনার মূল্যই বা কতটুকু বলতো? যুগযুগান্তের ইতিহাসটা নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করা ভালো, এর শিক্ষাটা গ্রহণ করতে পারলে, জীবনের ছোটখাট প্রাত্যহিক ঘটনাগুলি আর আমাদিগকে বিচলিত করতে পারবে না।

মনে কর তো সেই অনন্ত যুগের কথা, যখন পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর চিহ্ন ছিল না, তারপর আর এক অনন্ত যুগ যখন পৃথিবীতে কেবল সামুদ্রিক প্রাণীই রয়েছে—মানুষ নাই। তারপর বহু যুগ ধরে আরো নানা রকমের প্রাণীর সৃষ্টি হল, তারা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াল, মানুষের হাতে কাউকে প্রাণ হারাতে হয়নি, মানুষতো আর সেদিনে ছিল না।

বহু পরে মানুষের জন্ম হল—পৃথিবীর ছোটখাটো একটা খুদে প্রাণী, সবচেয়ে দুর্বল। অনেক হাজার বৎসর কেটে গেছে, মানুষের শক্তি আর বুদ্ধি আস্তে আস্তে

www.nagorikpathagar.org

বেড়েছে, আজ সে দেখ পৃথিবীর সব প্রাণীর প্রভু; সব প্রাণীই তার হুকুমের তাঁবেদার।

এর পর আস্তে আস্তে আরম্ভ হল সভ্যতার পরিণতি। এর সূচনার কথা তোমাকে বলেছি, পরের অবস্থাটা তোমাকে এখন বলব। এখন আর লক্ষ লক্ষ বৎসরের কথা বলব না। চিঠিতে যেসময়ে এসে পৌঁছেছি, সেটা চার-পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার কথা। যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের ইতিহাস তোমাকে আগে বলেছি, তার চেয়ে, এই চার-পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাসটা আমাদের ভালো জানা আছে। মানুষের ইতিহাস আর তার উন্নতি এই চার পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যেই গড়ে উঠেছে। বড় হয়ে এই ইতিহাসটা তুমি ভালো করে পড়বে। এই ছোট্ট পৃথিবীর মানুষগুলি কেমন করে কী হল তারই একটু ধারণার জন্য তোমাকে অল্প কিছু লিখব।

www.nagorikpathagar.org

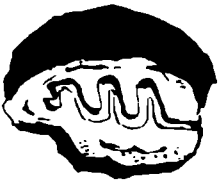

ফসিল এবং অতীতের স্মৃতি

কয়েকখানা ছবির পোষ্টকার্ড পাঠাচ্ছি তোমাকে। আমার বড় বড় নীরস চিঠিগুলি পড়ার চেয়ে ছবিগুলি দেখে হয়তো তুমি বেশি আনন্দ পাবে। এই কার্ডগুলি লন্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামের কতকগুলি মাছের ফসিলের ছবি। এই ফসিলগুলি অবশ্য তুমি সেখানে দেখেছ। তা হউক, এই ছবিগুলি আবার দেখে নিও, তবেই আদিম যুগের মাছের ফসিলগুলি দেখতে কেমন ছিল, সেই সম্বন্ধে তোমার ভাল ধারণা হবে।

ফসিলের কথা তোমাকে এর আগেই বলেছি, এগুলি হল, প্রাচীন যুগের প্রাণীদেহের অথবা চারা গাছের লুপ্তাবশেষ। পাহাড়ে এবং অন্যান্য জায়গায় এগুলি পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর প্রাণীদেহের নরম অংশটা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু হাড় এবং শরীরের অন্যান্য শক্ত অংশগুলি বহুকাল ধরে টিকে থাকে। প্রাচীন যুগের প্রাণীদেহের সেই হাড়গুলি সমুদ্রের তলায় নরম কাদা-মাটির নিচে ঢাকা পড়ে রক্ষিত ছিল। আস্তে আস্তে সেই নরম মাটিটা শক্ত হয়ে গেল। সমুদ্রের নিচে বহু যুগ ধরে কাদা আর মাটি সঞ্চিত হওয়ায় সমুদ্র-তল আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসল, আর তার থেকেই ডাঙ্গার সৃষ্টি হল। কাজেই প্রাচীন যুগের সব সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিলগুলি আমরা আজকাল শুকনো ডাঙ্গাতেই পাই। পাথরের গায়ে এই ফসিলগুলিকে যে অবস্থায় পাওয়া গেছে, ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে; তাই খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে দুটা হাতে তৈরি নকল, অর্থাৎ আসল ফসিলের অনুকরণে তৈরি হয়েছে।

ছবিগুলি আর সঙ্গে যে কাগজখানায় এদের বর্ণনা রয়েছে তা এনভেলপে পুরে রেখে দিও, সব জিনিসের সাথে মিশিয়ে ফেল না যেন।

অনেক দিন তোমাকে চিঠি লিখি নাই। এর আগের দুখানা চিঠিতে, সেই প্রাচীনযুগের কাহিনী যা তোমাকে আগে লিখেছি, তাই আবার ফিরে আলোচনা করেছি। ফসিলগুলি যে দেখতে কেমন, তাই বোঝাবার জন্য, মাছের ফসিলের কয়েকখানা ছবির পোস্টকার্ডও তোমাকে পাঠিয়েছিলাম। মুসৌরিতে যখন তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তখন আরও কতকগুলি ফসিলের ছবিও তোমাকে দেখিয়েছি।

কতকগুলি সরীসৃপের ফসিলের কথা হয়তো তোমার বিশেষ করে মনে আছে। সরীসৃপ কাহাকে বলে জান তো? যে সব প্রাণী বুকে হাঁটে তাদেরই সরীসৃপ বলে, যেমন আজকালকার দিনের সাপ, গিরগিটি, কুমির, কচ্ছপ ইত্যাদি। প্রাচীন যুগের

www.nagorikpathagar.org

সরীসৃপগুলিও এই পরিবারেরই ছিল, কিন্তু চেহারাটা মোটেই এখনকারগুলির মতো ছিল না, আকৃতিতে ছিল আরো অনেক বেশি বড়। সাউথ কেন্‌সিংটন মিউজিয়ামে যে সেই প্রাচীন যুগের অতিকায় জানোয়ারগুলি দেখেছিলে, তোমার মনে আছে বোধ হয়। এর একটা তো ছিল ৩০/৪০ ফুট লম্বা। একটা ব্যাং ছিল মানুষের চেয়েও বড়, আর একটা কচ্ছপও ছিল প্রায় মানুষের মতোই বড়। মস্ত মস্ত সব বাদুড় সে-দিনে উড়ে বেড়াত। আরেকটা জন্তু ছিল, নাম তার ইগুয়ানোডন (Iguanodon)। ওটা যখন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াত, তখন একটা ছোট গাছের সমান উঁচু হত।

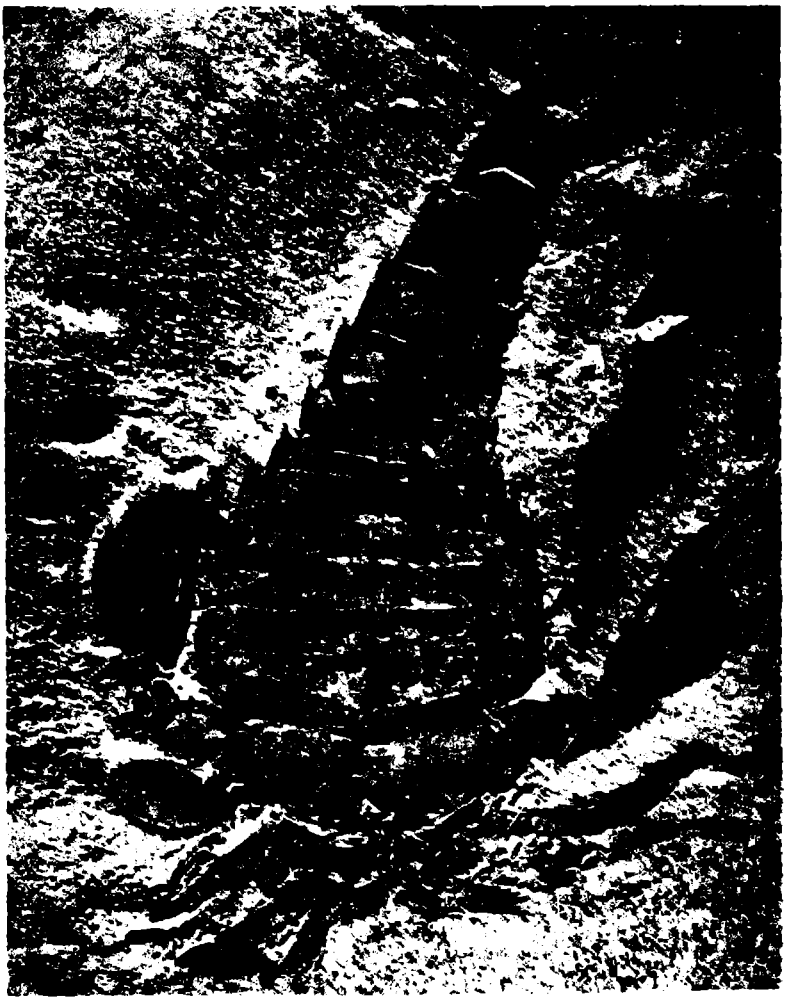

www.nagorikpathagar.org

প্রাচীন যুগের চারা গাছের ফসিলও তুমি দেখেছ। পাষাণের গায় পাতা, ফার্ন এসবের ছাপ আজও রয়ে গেছে। কবে জানি, কত লক্ষ বৎসর আগে, একটা নরম মাটির স্তরের উপর একটা পাতার ছাপ পড়েছিল, মাটিটা শক্ত হয়ে আজ পাথর হয়ে গেছে, সেই ছাপটা কিন্তু আজ পর্যন্তও অমনি পাথরের গায়ে রয়ে গেছে।

সরীসৃপের বহু পরে, স্তন্যপায়ী জন্তুর সৃষ্টি হয়েছে। এরা এদের সন্তানদের বুকের দুধ দেয়। আমাদের চারদিকে যে সব জন্তু দেখছ তার বেশির ভাগই, আর আমরাও স্তন্যপায়ী। প্রাচীন যুগের স্তন্যপায়ী জন্তুগুলি, আর এখনকার দিনের গুলির মধ্যে তফাত বিশেষ কিছু নেই। ওগুলি অবশ্য অনেক বড় ছিল, তবে সরীসৃপগুলির মতো অত বড় নয়। খুব মস্ত মস্ত দাঁতঅলা সব হাতি ছিল, আর শূকরগুলিও ছিল খুব বড়।

মানুষের ফসিলও তুমি দেখেছ,তবে ঐগুলি বেশির ভাগই ছিল কঙ্কাল, অস্থি আর মাথার খুলি। কাজেই ঐগুলি হয়তো তোমার খুব ভালো লাগে নাই। প্রস্তর যুগের মানুষের তৈরি পাথরের অস্ত্রগুলি দেখতে তোমার নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগেছিল।

মিশরের মামি আর কতকগুলি সমাধি মন্দিরের ছবিও তোমাকে দেখিয়েছি। এর কয়েকটাতো খুবই সুন্দর ছিল, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। কাঠের শবাধারগুলি, মানুষের জীবনের বিস্তৃত কাহিনী দিয়ে কেমন সুন্দর চিত্রিত ছিল। মিশরের থিব্‌স নগরের কয়েকটা কবরের কতকগুলি দেয়াল চিত্রও খুবই সুন্দর ছিল।

এই থিব্‌সের নিকটেই অনেক প্রাসাদে ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন তুমি দেখেছ। সেগুলি ছিল মস্ত মস্ত থামঅলা এক একটা বিশাল দালান।

থিব্‌সের নিকটেই মেমনের বিশাল প্রস্তর মূর্তি, একে বলা হয় 'কলোসাস্ অব মেমন' (Colossus of Memmon)।

উচ্চ মিশরে অন্তঃপাতি কর্ণাক নগরের অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির এবং দালানের ছবিও তুমি দেখেছ। এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত চিহ্নগুলি দেখেও তুমি কতকটা আঁচ করতে পারবে প্রাচীন মিশরিরা স্থপতিবিদ্যায় কত উন্নত ছিল। খুব ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান না থাকলে এত বড় বড় বাড়ি, মন্দির তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব হত না।

পেছন ফিরে যতটুকু দেখবার দেখে নিয়েছি, এবার চল আর একটু এগিয়ে যাই।

www.nagorikpathagar.org

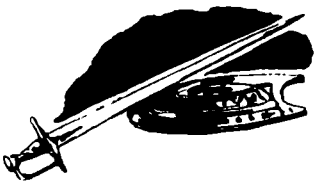

ভারতে আর্য জাতি

এ পর্যন্ত কেবল বহু প্রাচীন যুগের কাহিনীই বলে এসেছি। এখন দেখব, মানুষ কেমন করে উন্নতি করল, আর কী কী কাজ তারা করেছিল। যে সময়ের কথা এর আগে পর্যন্ত বলেছি তাকে বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক অর্থাৎ ইতিহাস আরম্ভ হওয়ার পূর্বেকার; কেন না, ঐ সময়কার ঠিক ঠিক কোনো ইতিহাস আমাদের জানা নেই, অনেক কিছুই অনুমান করে বলতে হয়। এখন আমরা ইতিহাসের একপ্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেছি।

ভারতবর্ষে কী ঘটেছিল তাই প্রথমে দেখা যাক। আমরা জানি, প্রাচীন যুগে মিশরের মত ভারতবর্ষেরও একটা সভ্যতা ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল, জাহাজে করে ভারতবর্ষের মাল মিশর, মেসোপোটামিয়া এবং অন্যান্য দেশে পাঠানো হত। সেই যুগে ভারতবর্ষে যারা বাস করত তারা হল দ্রাবিড় জাতি। দক্ষিণ ভারতে, আর মাদ্রাজের চারিদিকে যে সব লোক বাস করে তারা এই দ্রাবিড়দেরই বংশধর।

উত্তরদিক থেকে আর্যরা এসে দ্রাবিড়দের আক্রমণ করেছিল। মধ্য এশিয়ায় আর্যদের সংখ্যা একসময়ে খুব বেড়ে গেল এবং খাদ্যেরও টান পড়ে গেল। তারা তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক, পারস্য, গ্রিস এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে চলে গেল। কাশ্মিরের পাহাড় ডিঙ্গিয়ে দলে দলে তারা ভারতবর্ষেও এসে উপস্থিত হল।

আর্যগণ খুব শক্তিশালী যোদ্ধা ছিল, কাজেই দ্রাবিড়দের তারা সামনে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। যেন একটি ঢেউয়ের পর আর একটি এমনি করেই তারা উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকতে লাগল। দ্রাবিড়েরা হয়তো প্রথম প্রথম তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আর্যদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল, বেশিদিন আর তাদের প্রতিরোধ করা চলল না। বহুকাল, আর্যরা উত্তরদিকে পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তানের মধ্যেই রয়ে গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে তারা নিচে বর্তমান যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত নেমে আসল। শেষে তারা মধ্য-ভারতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এই বিন্ধ্যপর্বত ছিল ঘন বনে ঢাকা, কাজেই বিন্ধ্য পার হয়ে যাওয়ার আর সুবিধা হল না। বহুদিন ধরে আর্যরা বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর দিকেই রয়ে গেল। কেহ কেহ অবশ্য পাহাড় ডিঙিয়ে ওদিকেও চলে গেল, কিন্তু দল বেঁধে যাওয়া সম্ভব হয় নাই, কাজেই দক্ষিণদিকটা বেশিরভাগ দ্রাবিড়দেরই রয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

ভারতে আর্যদের আগমনকাহিনী পড়ে তুমি খুব আনন্দ পাবে। আমাদের পুরাতন সংস্কৃত বইগুলি থেকে এই বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। বেদের মতো কয়েকখানা বই এই সময়েই রচিত হয়েছিল। ঋগ্বেদ হল সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের যে-অংশটা আর্যদের অধিকারে ছিল, ঋগ্বেদে সেই দেশটার বর্ণনা রয়েছে। অপর কয়েকখানা বেদ এবং পুরাণের মতো কয়েকখানা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেও, আর্যদের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার কাহিনী জানা যায়। এই প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তোমার হয়তো খুব বেশি ধারণা নেই। তুমি বড় হয়ে এ সম্বন্ধে আরো অনেক জানবে। কিন্তু পুরাণের অনেক গল্পতো তুমি এর মধ্যেই শিখে ফেলেছ। এর অনেক পরে রামায়ণ আর তারও পরে মহাভারত রচিত হয়েছিল।

এই সব গ্রন্থ থকে আমরা জানতে পারি, আর্যরা যখন কেবল পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তানেই বাস করত, তখন সেই দেশটার নাম তারা রেখেছিল 'ব্রহ্মাবর্ত'; আফগানিস্তানকে বলা হত গান্ধার। মহাভারতের গান্ধারি দেবীর নাম মনে আছে তো? তিনি গান্ধার দেশ থেকে এসেছিলেন বলে তাঁর ঐ নাম হয়েছিল। আফগানিস্তান অবশ্য আজ আমাদের ভারতবর্ষ থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তখনকার দিনে এই দুইটি দেশ একই দেশের অংশ ছিল।

আর্যরা যখন ক্রমে ক্রমে আরো নিচে, গঙ্গা এবং যমুনার উপত্যকা ভূমিতে এসে পড়ল, তখন সমস্ত উত্তর ভারতকে তারা বলত আর্যাবর্ত।

অন্যান্য দেশের প্রাচীন জাতিগুলির মতোই তারাও নদীর তীরেই বসবাস আরম্ভ করল। কাশী, প্রয়াগ আর এমনি আরো অনেক প্রসিদ্ধ নগর, নদীর তীরেই অবস্থিত।

www.nagorikpathagar.org

ভারতীয় আর্যগণ কেমন ছিলেন

পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর, হয়তো বা তারও আগে, আর্যরা প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করে। অবশ্য সবাই মিলে দল বেঁধে একসঙ্গে আসে নাই। একটি বাহিনীর পর আর একটি, একটি দলের পর আর একটি, একটি পরিবারের পর আর একটি, এমনি করেই তারা শত শত বর্ষ ধরে ভারতবর্ষে ঢুকেছিল। সেদিনের কথা আজ একটু কল্পনা করে দেখ—মস্ত দল বেঁধে তাদের পথ চলা শুরু হয়েছে, গৃহস্থালির জিনিসপত্র সব গাড়ি নয়তো গরুর পিঠে বোঝাই করে তারা সাথে সাথে চলেছে। আজকালকার পর্যটক অথবা টুরিস্টদের মতো ভ্রমণ উদ্দেশ্যে তাদের আগমন নয়, পেছন ফিরবার তাদের উপায় ছিল না। তারা এসেছিল চিরজীবন বসবাস করার জন্য, নয়তো যুদ্ধ করে মরতে। তোমাকে তো বলেছি, তাদের বেশির ভাগই এসেছিল উত্তর-পশ্চিম কোণের পাহাড় ডিঙিয়ে। কেউ কেউ হয়তো বা সমুদ্রপথে তাদের ছোট ছোট জাহাজে চড়ে পারস্য উপসাগর দিয়ে একেবারে সিন্ধুর বুক বেয়ে উপরে উঠে এসেছিল।

এই আর্যজাতির লোকেরা কেমন ছিল? তাদের লেখা বই পড়ে অনেক কথাই জানা যায়। এই বইগুলির মধ্যে কয়েকখানা, যেমন বেদ চারখানা, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন বই। প্রথমেই এগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয় নাই; শ্লোকগুলি মুখস্থ করে রাখা হত এবং অন্যের কাছে গান গেয়ে শুনানো হত। এই বেদের রচনা এত সুন্দর যে প্রায় গানের সুরেই বেদ পাঠ করা চলে।

কোনো সুকণ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের মুখে বেদ গান বড় মধুর শুনায়। 'বেদ' হিন্দুদের অতি পবিত্র গ্রন্থ। কিন্তু 'বেদ' শব্দের অর্থ কী জানো? 'বেদ' অর্থ জ্ঞান। সেই প্রাচীন যুগের মুনিঋষিরা যেই জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাই বেদের মধ্যে রয়েছে। সেই দিনে অবশ্য রেলগাড়ি, সিনেমা, টেলিগ্রাফ, এসব কিছুই ছিল না, কিন্তু তাই বলে যে তারা জ্ঞানী ছিলেন না, তা মনে করো না। কারোর কারোর ধারণা সেই যুগের জ্ঞানী লোকেরা আজকের যে-কোনো লোকের চেয়ে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। তা যাই হোক, তারা এমন সব সুন্দর সুন্দর বই লিখে গেছেন, যে আজ পর্যন্তও লোকে সেইসব বইয়ের আদর করে, এতেই বুঝবে সেই প্রাচীন যুগের লোকেরা কত শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তোমাকে বলেছি, এই বেদগ্রন্থ প্রথমেই লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। সমস্ত বইগুলি মুখস্থ করে রাখা হত, আর তাই পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে চলে আসত। কী অদ্ভুত স্মরণশক্তি! এই যুগের কয়জন লোক সমস্ত বই মুখস্থ করে রাখতে পারে?

যে যুগে বেদ রচিত হয়েছিল, তাকে বলা হয় বৈদিক যুগ। চারখানা বেদের প্রথমখানা ঋগ্বেদ। সমস্ত ঋগ্বেদখানাই কতকগুলি স্তোত্র আর গানে ভরা, প্রাচীন আর্যগণ এই স্তোত্রগুলি গান করতেন। ভারি আমুদে প্রকৃতির লোক ছিলেন এঁরা, মুখ ভার করে থাকতেন না মোটেই, জীবন ছিল তাঁদের আনন্দে ভরা, প্রকৃতি ছিল বেপরোয়া। মনের আনন্দে তাঁরা সুন্দর সুন্দর গান রচনা করতেন, আর আরাধ্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে সেই গান গাইতেন।

নিজেদের সম্বন্ধে আর তাদের জাতির সম্বন্ধে তাদের গর্বের আর অবধি ছিল না। আর্য শব্দটির মানেই কিন্তু ভদ্রলোক, অর্থাৎ একজন বিশিষ্ট লোক। স্বাধীনতা তাঁরা ভালোবাসতেন খুব। তাঁদেরই ভারতবর্ষের বংশধর আমরা, আজ সাহসহীন, স্বাধীনতাহারা। আমাদের মনে যেন তবু দুঃখ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু এরকম ছিলেন না। প্রাচীন আর্যগণ অসম্মান আর দাসত্বের চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করতেন।

তাঁরা ভালো যোদ্ধা ছিলেন, বিজ্ঞানের জ্ঞানও তাঁদের ছিল, আর কৃষিবিদ্যার জ্ঞান তো খুব বেশিই ছিল। স্বভাবতই তাঁরা কৃষিবিদ্যাকে বড় বলে মনে করতেন, আর যাদের কাছ থেকে কৃষির সাহায্য পেতেন তাদের মূল্যও বুঝতেন। নদী ছিল তাঁদের জলদাত্রী, কাজেই নদীকে তাঁরা ভালোবাসতেন, আর নদীকে মনে করতেন তাঁদের উপকারী বন্ধু। ষাঁড়, গরু এরাও তাঁদের কৃষির সাহায্য করত, তাঁদের নিত্যকার জীবনযাত্রার বন্ধু ছিল। গরু তাঁদের দুধ দিত, আর দুধ তাঁদের খুব প্রয়োজনীয়ও ছিল। কাজেই এই পশুগুলির তাঁরা যত্ন করতেন, তাদের প্রশংসা করে গান গাইতেন। বহুদিন পরে, এদেশে মানুষ কিন্তু গরুকে যত্ন করবার আসল কারণটি ভুলে গিয়ে, গরুকে পূজা করাই আরম্ভ করে দিল, যেন এতেই তাদের মস্ত উপকার হবে।

আর্যগণ ছিলেন ভয়ানক গর্বিত, তাঁদের ভয় ছিল, ভারতবর্ষের অন্যান্য সব জাতির সাথে পাছে তাঁরা মিশে যান। কাজেই তাঁরা বিধিবিধান দ্বারা এই মিশ্রণটা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, যাতে আর্যরা অন্যদের বিবাহ না করতে পারে। বহু পরে, ঐ বিধির জোরেই আজকের দিনের জাতিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল তো এই জাতিভেদ একটা মস্ত প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অনেক আছে, যারা অন্যকে স্পর্শ করবার, অথবা অন্যের সাথে আহারের কথায় আঁতকে ওঠে। সুখের বিষয়, এই অদ্ভুত প্রথাটা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

রামায়ণ ও মহাভারত

বেদ রচনার সময়কে বৈদিক যুগ বলা হয়। এই বৈদিক যুগের পরে হল মহাকাব্যের যুগ, এই সময় দুইখানা মহাকাব্য—খুব মস্ত কবিতায় বড় বড় বীরপুরুষদের কাহিনী—লেখা হয়েছিল। এই দুইখানা মহাকাব্য হল রামায়ণ ও মহাভারত।

এই মহাকাব্যের যুগে আর্যগণ বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তোমাকে তো আগেই বলেছি, এই দেশটাকে আর্যাবর্ত বলা হত। এখনকার যুক্ত প্রদেশকে বলা হত 'মধ্যদেশ', বাঙ্গালাকে বলা হত 'বঙ্গ'।

এখন তোমাকে একটা মজার কথা বলব। ভারতবর্ষের মানচিত্রখানা দেখ, আর হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের মাঝের যে ভূখণ্ডকে আর্যাবর্ত বলা হত তাই একবার মনে মনে ভেবে নাও। দেখবে, এই অংশটাকে মনে হবে যেন একটি অর্ধচন্দ্র। কাজেই আর্যাবর্তকে বলা হত ইন্দুদেশ—ইন্দু মানে চন্দ্র।

আর্যগণ এই অর্ধচন্দ্রাকারটি বড়ই ভালোবাসতেন। অর্ধচন্দ্রাকারের সব দেশকেই তাঁরা খুব পবিত্র মনে করতেন। বারাণসীর মতো অনেক তীর্থস্থানই অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তোমার জানা আছে কিনা বলতে পারিনা, গঙ্গা কিন্তু এলাহাবাদকেও অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে আছে।

রামায়ণের কথাতো জানই—এ হল রামচন্দ্র ও সীতা দেবীর কাহিনী, রামের সাথে লঙ্কার রাজা রাবণের যুদ্ধ। লঙ্কা হল এখনকার সিংহল (Ceylon)। মূল কাব্যখানা লিখেছেন বাল্মীকি, সংস্কৃত ভাষায়। পরে অন্যান্য আরও অনেক ভাষায় রামায়ণ অনূদিত হয়। এগুলোর মধ্যে তুলসীদাসের অনুবাদে হিন্দী ভাষায় যে রামায়ণ রচিত হয়েছে, সেটাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট।

রামায়ণে উল্লেখ আছে দক্ষিণ ভারতে বানরেরা রামকে প্রভুত সাহায্য করেছিলো এবং হনুমান ছিলো সেইসব বানরদের মহানায়ক। এমনও হতে পারে যে রামায়ণে বর্ণিত গল্প আসলে আর্যদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের যুদ্ধেরই কাহিনী—যাদের নেতা ছিলেন রাজা রাবণ। এখানে মনে হয় 'বানর' বলতে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদেরই বোঝানো হয়েছে।

রামায়ণে অনেক মজার মজার গল্প আছে, কিন্তু সেগুলো এখানে বলছি না। সময় করে তুমি নিজেই সেগুলো পড়ে নেবে।

রামায়ণের অনেক পরে লেখা হয় মহাভারত। আকারে রামায়ণের থেকে মহাভারত আরও বড়। অবশ্য এতে আর্যদের সাথে দ্রাবিড়জাতির যুদ্ধের বর্ণনা নেই,

www.nagorikpathagar.org

তারপরেও এতে আছে এক বিড়াট যুদ্ধকাহিনী, সে যুদ্ধ– আর্যদের সঙ্গে আর্যদের। যুদ্ধকাহিনী ছাড়াও মহাভারত এক অসাধারণ গ্রন্থ। যুদ্ধের কথা ছাড়াও এতে আছে কত ভালো ভালো মহান সব আদর্শের কাহিনী– যা পড়ে অনেক কিছু জানার এবং শেখার আছে। এতো কিছু বাদ দিয়েও এই মহাভারত বইটি আমাদের সবার কাছে এতো প্রিয় হবার কারণ, এই বিশাল কাব্যের মাঝে রয়েছে অনুপম কাব্য– ভগবদ্‌গীতা।

ভারতবর্ষে এইসব বই-ই লেখা হয়েছিলো হাজার হাজার বছর আগে। মহাজ্ঞানী ছাড়া এসব বই আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। যদিও সেই কবে কোন যুগে এই বইগুলো লেখা হয়েছিল, কিন্তু আজো ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মনে এই বইগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালোবাসা অটুট হয়ে আছে।

www.nagorikpathagar.org

নাইটফল

আইজাক আসিমভ

ছয় সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ এক গ্রহে নেমে আসছে অন্ধকার রাত, দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ... ...

ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সম্মুখীন কালগাশ গ্রহ– কিন্তু অল্প কয়েকজন মানুষই তা জানে। কালগাশ গ্রহের দিনের আলো অবিনশ্বর, ছয়-ছয়টি সূর্য একসাথে আলোকিত করে রাখে গ্রহের আকাশ। কিন্তু দুহাজার বছর পরে এই প্রথম ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে রাত, কিছুক্ষণ পরেই ছয়টি সূর্য একসাথে অস্ত যাবে– এবং রাতের নিশ্ছিদ্র ভয়-জাগানো অন্ধকারের সাথে পরিচয়হীন মানুষগুলো সীমাহীন আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে যাবে, সামান্য একটু আলোর জন্য জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে সবকিছু– ফলশ্রুতিতে ধ্বংস হয়ে যাবে কালগাশ গ্রহের বুকে গড়ে উঠা সভ্যতা।

আইজাক আসিমভের ছোটগল্প ***নাইটফল*** প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে। সাথে সাথেই গল্পটি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে। লেখক পরিণত হন কিংবদন্তীতে। কিন্তু গল্পটি লেখা হয়েছিল ক্ষুদ্র পরিসরে। অনেক প্রশ্নের জবাবই লেখক তাতে দিতে পারেন নি। তাই ড. আসিমভ প্রায় তারই সমকক্ষ এবং একাধিকবার হুগো আর নেবুলা পুরস্কার বিজয়ী কল্পকাহিনী লেখক রবার্ট সিলভারবার্গের সাথে মিলে ***নাইটফল*** গল্পটিকে উপন্যাসে রূপ দেন। এই উপন্যাসটিকে বিবেচনা করা হয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর ইতিহাসে সর্বাধিক জনপ্রিয়, মনোমুগ্ধকর এবং বিস্ময়কর কল্পকাহিনী হিসেবে। মূল ছোট গল্পটিকেই এই উপন্যাসে বিশাল পরিসরে বিস্তৃত করেছেন লেখকদ্বয়। অনেক প্রশ্নের জবাবই এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তারা। এই বই পড়ে পাঠক নিজের অজান্তেই অনুভব করবেন রাতের গভীরতা, দিনের অবসায়নের তাৎপর্য।

নাইটফল-এর বাংলা অনুবাদ করেছেন : নাজমুছ ছাকিব

---

www.nagorikpathagar.org

বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে নিজেদের মা-বাবাকে দেবতার মতো মনে করে। আমার মা-বাবা যেমন আমার পরম বন্ধু ছিলেন সেরকম কিন্তু সকলের মা-বাবা হন না। সব কিছুতেই আমার বাবার আগ্রহ ছিল। নিজের কৌতূহলকে অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তিনি খুশি হতেন। অনেক রকম প্রশ্ন আমার মনে জাগত। আর এই প্রশ্নগুলির জন্যই তিনি আমাকে পৃথিবী সম্পর্কে নানা কথা বলতে পেরেছিলেন– যেসব মানুষ এখানে বাস করত তাদের কথা, তাদের আদর্শ ও কাজকর্ম এবং সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে দিয়ে কীভাবে অন্যদের মুগ্ধ করেছিল সেই-সব কথা। আমার বয়স যখন আট কিংবা নয় তখন এই বইয়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল। পৃথিবীর প্রথম যুগের কথা এবং কীভাবে মানুষ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল সে কথা চিঠিগুলিতে বলা হয়েছে। এ চিঠিগুলি শুধু একবার পড়েই ফেলে দেবার মতো নয়, এগুলি পড়ে আমি নিজের চোখে সব কিছু দেখতে শিখি। এগুলি মানুষের সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে আমার মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। এ-সব চিঠি পড়েই প্রকৃতিকে আমি একটি বই হিসেবে দেখতে শিখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে আমি পাথর, গাছপালা, পোকামাকড়দের জীবন এবং রাতে আকাশের নক্ষত্র দেখেছি।

— ইন্দিরা গান্ধী

ISBN 978 984 7210 17 9
9 789847 210179